POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُوْنَ (الصّف:10)

তিনিই তাঁহার রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

(আস সফ: ১০))

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 10-11

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 9-16 মার্চ, 2023 16-23 শাবান 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আহমদীয়াতের বয়াতের শর্তাবলী

১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক হইতে পবিত্র থাকিবে।

২) মিথ্যা, ব্যভিচার,কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেনা উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ পড়িবে, রসূলে করীম (সা.)-প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিবে এবং ইসতেগফার পড়িবে, ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপরা অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হামাদ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে,কথায়, কাজে বা অন্য কোনও উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসুলে করীম (সা.) এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরন করিয়া চলিবে।

৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তম জ্ঞান করিবে।

৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০) আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল,জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহর তাকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মসীহ মওউদ (আ.) সংখ্যা

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতুলনীয় ভালবাসা

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর সব থেকে বড় প্রেমিক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় প্রভু মহম্মদ (সা.)কে এতটা ভালবাসতেন যার দৃষ্টান্ত বিগত চৌদ্দশ বছরে আমরা কোথাও দেখতে পাই না।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বক্তৃতা ও লেখনী, নযম, তাঁর চালচলন, ওঠাবসা, কথাবার্তা, চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, নিদ্রা ও জাগরণ সব কিছু থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসার আঘ্রান পাওয়া যায়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

وَذِكْرُ الْمُصْطَفٰى رُوحٌ لِقَلْبِي .....☆..... وَصَارَ لِمُهْجَتِي مِثْلَ الطَّعَامِ

মহম্মদ মুস্তফার স্মৃতি আমার বক্ষের আত্মা আর তাঁকে স্মরণ করা আমার আহার, যেটি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

يَا حِبِّ إِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مَحَبَّةً .....☆..... فِي مُهْجَتِي وَمَدَارِكِي وَجَنَانِي

হে আমার প্রেমাস্পদ! ভালবাসার দিক থেকে তুমি আমার দেহ ও প্রাণে প্রবেশ করে একীভূত হয়ে আছ। আমার মন , প্রাণ ও বক্ষে কেবল তুমিই বাস কর।

مِنْ ذِكْرِ وَجْهِكَ يَا حَدِيْقَةَ بَهْجَتِي .....☆..... لَمْ أَخْلُ فِي لَحْظٍ وَّلَا فِي آنِ

অর্থাৎ হে আমার আনন্দ ও সুখের বাগান! তোমার স্মরণ ছাড়া আমার একটি মুহূর্তও বাকি থাকে না।

সুধী পাঠকবর্গ! নবীগণের ভাষায় অতিরঞ্জকতা থাকে না। এটা ভীষণভাবে সত্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কখনও এক মুহূর্তের জন্যও আঁ হযরত (সা.)-কে স্মরণ থেকে বিস্মৃত হন নি। যার উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ধর্মকে সারা পৃথিবীতে জয়যুক্ত করতে হবে, যে এই পথে সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়েছে, সে কিভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসা ও তাঁর স্মরণ থেকে দূরে থাকতে পারে?

إِنِّيْ أَمُوْتُ وَلَا تَمُوْتُ مَحَبَّتِيْ .....☆..... يُدْرٰى بِذِكْرِكَ فِي التُّرَابِ نِدَائِيْ

আমি তে একদিন মৃত্যু বরণ করব। কিন্তু আমার ভালবাসা অমর। আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের মাটি থেকে তোমার ভালবাসার ধ্বনি উত্থিত হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসা ও আনুগত্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণেই তাঁর আগমণকে আঁ হযরত (সা.)-এর আগমণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

যদি কোনও অন্য ব্যক্তি আসে তবে অভিমান হয়, কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেই আসছেন, সেক্ষেত্রে কিসের অভিমান? এর উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখে আর পাশে তার স্ত্রীও দাঁড়িয়ে থাকে, তবে কি তার স্ত্রী আয়নার মধ্যে থাকা ব্যক্তির ছবি দেখে কোনও পর্দা করবে? কিম্বা সে মনে করবে যে, কোনও পরপুরুষ এসে গেছে তাই পর্দা করা উচিত? নাকি স্বামী একথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে পড়বে যে কোনও তার স্ত্রীর সামনে একজন পরপুরুষ এসে পড়েছে? না। বরং আয়নায় সেই স্ত্রীর প্রতিবিম্ব থাকে, অন্য কেউ সেই প্রতিবিম্বকে পর বলে মনে করে না, এই ধরণের ভাবনাও মাথায় আসে না।

অনুরূপ অবস্থা প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের। তিনি অন্য কেউ নন, আর আঁ হযরত (সা.)-এর ভিন্ন সত্তাও নন। তিনি কোনও নতুন শিক্ষা বা বিধান নিয়ে আসেন নি, বরং সে আঁ হযরত (সা.)-এরই প্রতিবিম্ব, এটা তাঁরই আগমণ যার কারণে আঁ হযরত (সা.)কে মসীহ্‌র আগমণে কোনও অস্বস্তি হয় নি, বরং তিনি তাকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন। আর -'সে আমার কবরে সমাহিত হবে'-আঁ হযরত (সা.)-এর এই বাণীর এটিই নিগূঢ় অর্থ। এটি পরম পর্যায়ের একাত্মতাকে নির্দেশ করে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮১)

দদদদদদদদদ

অর্থাৎ আমি ভালবাসার কারণে আধ্যাত্মিকভাবে রসুলের 'রওজা'য় প্রবেশ করব। কিন্তু হেদায়াতের শত্রু! তুমি এই নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

সুধীপাঠকবর্গ! সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-কে পরম ভালবেসেছেন আর নিজের জামাতকেও সত্যিকার ভালবাসার

সূচিপত্র

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী	১
সম্পাদকীয়	২
হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত খুতবা জুমা	৩
মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ভালবাসা	৯
জামাতের উন্নতির সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ	১৭
হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খতুবা	১২

*****❖*****❖*****❖*****

শিক্ষা দান করেছেন। তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার আজ্ঞানুবর্তিতাকেই নাজাতের পথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। একবার নয়, বরং বারবার তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, যা কিছু তিনি লাভ করেছেন তা আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণেই লাভ করেছেন তা তার নিজের নয়, বরং আঁ হযরত (সা.)-এর । তিনি বলেন-

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৩)

তিনি বলেন-

কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পেতে আগ্রহী হয়, তবে এমন ব্যক্তির জন্য তিনি এই শর্ত নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, সে যেন আঁ হযরত (সা.)-এর আজ্ঞানুবর্তিতা করে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল, আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার আজ্ঞানুবর্তিতা এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা শেষমেশ মানুষকে খোদার প্রিয় বানিয়ে দেয়। '

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-২২, পৃ: ৬৭)

তিনি আরও বলেন-

" আমার জন্য এই অনুগ্রহ লাভ সম্ভব ছিল না, যদি না আমি আমার প্রিয় নেতা নবীগণের গর্ব এবং সৃষ্টি সেরা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পথ অনুসরন না করতাম। অতএব, যা কিছু আমি পেয়েছি তা এই অনুসরনের ফলেই পেয়েছি। আর আমি নিজের সত্যিকার ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে জানি যে, কোনও মানুষ এই নবীর আনুগত্য ব্যতিরেকে খোদা পর্যন্ত পোঁছতে পারে না আর পরিপূর্ণ মারেফাত থেকে কোনও অংশ পাবে না।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৪)

তিনি বলেন-

'এই সম্মান আমি কেবল আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে লাভ করেছি। যদি না আমি আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মত না হতাম আর তাঁর আনুগত্য না করতাম, তবে আমার সৎকর্ম যদি পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমতুল্যও হত, তথাপি আমি খোদার সঙ্গে বাক্যলাপের সম্মান কখনওই লাভ করতাম না।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৪১১)

মৌলবী রহীম বখশ সহেব এম.এ-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুত্র মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব একবার বলেন-

"আঁ হযরত (সা.)এর প্রতি আমার পিতার ভালবাসা ছিল উন্মাদনার পর্যায়ের। এমন ভালবাসা আমি কখনও কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখি নি।"

(সীরাতুল মাহদী, রেওয়ায়েত নম্বর-১৯৬, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ লেখেন-

"আঁ হযরত (সা.)এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসা সেই পরম বিন্দুকে স্পর্শ করেছিল যেখানে অন্য কোনও ব্যক্তির ভালবাসা পোঁছতে পারে না। "

(সীরাতুল মাহদী, রেওয়ায়েত নম্বর-৫৪৭)

এরপর ১১পাতায়....

জুমআর খুতবা

আহমদীয়া জামা'তে এই প্রাণের কুরবানী যা হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.) শহীদের কুরবানীর মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে তা সাধারণত আফগানিস্তান এবং উপমহাদেশীয় আহমদীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। আফ্রিকায়ও ২০০৫ সনে কঙ্গোতে একজন নিষ্ঠাবান আহমদী কেবল জামা'তের জন্য প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন কিন্তু অতিসম্প্রতি আফ্রিকা মহাদেশের দেশ বুরকিনা ফাসোতে ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও ঈমান এবং দৃঢ়বিশ্বাসে পরিপূর্ণ যে দৃষ্টান্ত জামা'তের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে প্রদর্শন করেছেন তা বিস্ময়কর, নিজেই নিজের উপমা।

এরাই সেসব লোক যারা আফ্রিকায় বরং আহমদীয়াতের ভুবনে নিজেদের কুরবানীর এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের কুরবানীর পর। নিজেদের পার্থিব জীবনের কুরবানী করে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন। যারা তাদের প্রাণ, সম্পদ ও সময় কুরবানীর যে শর্তে বয়আত করেছেন তা পূর্ণ করেছেন আর এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যে, পরে এসেও অগ্রজদের অতিক্রম করে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রত্যেককে সেসব সুসংবাদের ভাগিদার করুন যে-সব সুসংবাদ তিনি তাঁর পথে কুরবানীকারীদের জন্য দিয়েছেন।

কোনো একজনও সামান্যতম দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি আর আহমদীয়াতও পরিত্যাগ করেন নি। একের পর এক শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন কিন্তু কারো ঈমান দোদুল্যমান হয় নি। সবাই একে অপরের চেয়ে অধিক দৃঢ় ঈমান ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন এবং ঈমানের পতাকা উড্ডীন রেখে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেন।

আমি যখন স্বর্ণ দেখেছি এবং আল্লাহ্ তা'লা একে (গ্রহণ করার) নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস পূর্ণ হচ্ছে, কথাও পূর্ণ হচ্ছে, পবিত্র কুরআন এর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাই এখন আমি এটি অস্বীকার করব আর (এ থেকে) বঞ্চিত থাকব তা কীভাবে সম্ভব!

এসব কুরবানী প্রদানকারী তো এই পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এখন তাদের জন্যও নিজ নিজ ঈমান ও একীনে উন্নতি করার পরীক্ষা যারা পিছনে রয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এবং আমাদেরকেও পূর্ণাঙ্গীন ঈমান ও একীনে অটল থাকার সামর্থ দিন।

এসব শহীদের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লা উত্তরোত্তর উন্নিত করুন। তাদের এসব আত্মত্যাগকে তিনি ফুলেফলে সুশোভিত করুন যার ফলে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে আমরা পৃথিবীর বুকে দ্রুততম সময়ে বিস্তার লাভ করতে দেখতে পাই। এছাড়া পৃথিবী থেকে অজ্ঞতা দূরীভূত হোক এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রকৃত রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২০ শে জানুয়ারী, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২০ সুলাহ, নবুয়ত, ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○ (البقرة:155-157)

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন কর না। আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে কতক ভয়ভীতি, ক্ষুধা. ধনসম্পদ এবং প্রাণ ও ফলফলাদির ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব আর ধৈর্য শীলদের সুসংবাদ দাও। তাদের ওপর যখন কোনো বিপদ আপতিত হয় তখন তারা বলেন, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর আর নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা আল বাকারা: ১৫৫-১৫৭)

আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গকারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার অমোঘ ঘোষণা হলো, তারা মৃত নয় বরং জীবিত। জামা'তে আহমদীয়ায় বিগত শতাধিক বছর যাবৎ আল্লাহ্ তা'লার পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। তাদের কুরবানী কি বৃথা গিয়েছে? না, বরং যেখানে আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এসব শহীদের মর্যাদাকে সমুন্নত করছেন সেখানে জামা'তকে পূর্বের চেয়ে অধিক উন্নতি দান করেছেন। এসব শহীদ যেখানে পরপারে সেই মর্যাদা লাভ করেছেন যা তাদের প্রাপ্য আর তাদের মর্যাদা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে সেখানে এ পৃথিবীতেও চিরকালের জন্য তাদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার পথে তাদের প্রাণ উৎসর্গ করা কেবল নিজেদের জন্য নয়, বরং জামা'তের জীবন লাভেরও কারণ হচ্ছে। এটিই পরবর্তী প্রজন্মের জীবন এবং উন্নতির মাধ্যম হচ্ছে।

তাহলে তারা কীভাবে মৃত হতে পারে? আহমদীয়া জামা'তে এই প্রাণের কুরবানী যা হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.) শহীদের কুরবানীর মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে তা সাধারণত আফগানিস্তান এবং উপমহাদেশীয় আহমদীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। আফ্রিকায়ও ২০০৫ সনে কঙ্গোতে একজন নিষ্ঠাবান আহমদী কেবল জামা'তের জন্য প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন কিন্তু অতিসম্প্রতি আফ্রিকা মহাদেশের দেশ বুরকিনা ফাসোতে ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও ঈমান এবং দৃঢ়বিশ্বাসে পরিপূর্ণ যে দৃষ্টান্ত জামা'তের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে

প্রদর্শন করেছেন তা বিস্ময়কর, নিজেই নিজের উপমা।

যাদেরকে (একথা বলে) সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, "মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা অস্বীকার করো এবং এ বিষয়টি মেনে নাও যে, ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আছেন আর আকাশ থেকেই অবতরণ করবেন" তাহলে আমরা তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিব। কিন্তু ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপুর্ণ এসব লোক যাদের ঈমান পাহাড়ের চেয়েও অধিক দৃঢ় মনে হয় তারা জবাব দিয়েছেন, আজ নয় তো কাল, প্রাণ তো একদিন যাবেই। তাই একে বাঁচানোর জন্য আমরা আমাদের ঈমান বিক্রি করতে পারি না। যে সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। আর এভাবে তারা একজনের পর আরেকজন নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে থেকেছেন।

তাদের নারী এবং শিশুরাও (রোমহর্ষক) এই দৃশ্য দেখছিল অথচ কেউ কোনো আহাজারি করে নি।

অতএব এরাই সেসব লোক যারা আফ্রিকায় বরং আহমদীয়াতের ভুবনে নিজেদের কুরবানীর এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের কুরবানীর পর। নিজেদের পার্থিব জীবনের কুরবানী করে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন। যারা তাদের প্রাণ, সম্পদ ও সময় কুরবানীর যে শর্তে বয়আত করেছেন তা পূর্ণ করেছেন আর এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যে, পরে এসেও অগ্রজদের অতিক্রম করে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রত্যেককে সেসব সুসংবাদের ভাগিদার করুন যে-সব সুসংবাদ তিনি তাঁর পথে কুরবানীকারীদের জন্য দিয়েছেন।

এখন সংক্ষিপ্তভাবে এসব শহীদের জীবনী বর্ণনা করব যা থেকে তাদের ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে জানা যায়। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বুরকিনা ফাসোর ডোরি শহর যেখানে মেহদিয়াবাদ নামেনতুন একটি জনবসতি গড়ে উঠেছে সেখানকার জামা'ত। ১১ জানুয়ারি এশার সময় ৯জন আহমদী বুযু র্গ কে মসজিদ প্রাঙ্গণে অন্য নামাযীদের সামনে ইসলাম আহমদীয়াত অস্বীকার না করার কারণে এক এক করে শহীদ করা হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

রিপোর্ট অনুযায়ী এশার সময় ৪টি মোটর সাইকেলে মোট ৮জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি মসজিদে আসে। এই অস্ত্রধারীরা আহমদীয়া মসজিদে আসার পূর্বে নিকটবতী ওহাবী মসজিদে অবস্থান করছিলআর সেখানে তারা মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করে, কিন্তু সেখানে তারা কারো কোনো ক্ষতি করে নি, কেননা তারা আহমদীদের উদ্দেশ্যেই এসেছিল। এই সন্ত্রাসীরা যখন আহমদীয়া মসজিদে আসে তখন মসজিদে এশার আযান হচ্ছিল। ততক্ষণে কিছু নামাযীও এসে গিয়েছিলেন এবং অন্যরাও আসছিলেন। আযান শেষ হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা মুয়ায্যিনকে দিয়ে ঘোষণা করায় যে, বন্ধুরা দ্রুত মসজিদে চলে আসুন, কিছু লোক এসেছে তারা কথা বলবে। মানুষ একত্রিত হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা জিজ্ঞেস করে, এখানে মসজিদের ইমাম কে?

আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব বলেন, তিনি হলেন মসজিদের ইমাম। এরপর তারা জিজ্ঞেস করে, নায়েব ইমাম কে? উত্তরে আগউমর আগ আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, তিনি নায়েব ইমাম। নামাযের সময় হয়ে গেলে ইমাম ইব্রাহীম সাহেব সন্ত্রাসীদের বলেন, আমাদেরকে নামায পড়ে নিতে দাও কিন্তু তারা নামায পড়ার অনুমতি দেয় নি।

অস্ত্রধারীরা ইমাম সাহেবের কাছে আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করে যার উত্তর ইমাম সাহেব অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এবং সাহসিকতার সাথে প্রদান করেন। ইমাম সাহেব বলেন, আমরা মুসলমান আর আমরা মহানবী (সা.)-এর মান্যকারী।

তারা জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোন্ ফিরকার সাথে জড়িত? ইমাম সাহেব উত্তরে বলেন, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য। অতঃপর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারা অর্থাৎ সন্ত্রাসীরা জিজ্ঞেস করে, আপনাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আছেন না কি মারা গেছেন? ইমাম সাহেব বলেন, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। যাহোক, একথা শুনে সন্ত্রাসীরা বলে, না, ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে বিদ্যমান আর ফিরে এসে তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং মুসলমানদের সমস্যাদি নিরসন করবেন। এ আশাতেই তারা বুক বেধে বসে আছে। এরপর তারা জিজ্ঞেস করে, ইমাম মাহদী কে? ইমাম সাহেব বলেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। সব কথা শোনার পর অস্ত্রধারীরা বলে, আহমদীরা মুসলমান নয় বরং শক্ত কাফের।

এরপর তারা ইমাম সাহেবকে মসজিদ সংলগ্ন আহমদীয়া সিলাই সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি টাঙানো ছিল। সেসব ছবি নিয়ে তারা পুনরায় ইমাম সাহেবকে নিয়ে মসজিদে ফিরে আসে। এরপর সেসব ছবি সম্পর্কে ইমাম ইব্রাহীম সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ইমাম সাহেব হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের নাম বলেন আর প্রতিটি ছবির পরিচয় তুলে ধরেন আর বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। একথা শুনে তারা বলে, (নাউযুবিল্লাহ্) মির্যা গোলাম আহমদ-এর নবুয়্যতের দাবি মিথ্যা। এরপর সন্ত্রাসীরা মসজিদে উপস্থিত নামাযীদের মধ্য থেকে শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করে। মসজিদে তখন আবালবৃদ্ধবনিতা সবমিলিয়ে ৬০ থেকে ৭০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পর্দার আড়ালে ১০-১২জন লাজনা নামাযের জন্য উপস্থিত ছিলেন। বয়সের দিক থেকে দল গঠনের পর সন্ত্রাসীরা বয়োজ্যেষ্ঠদের বলে, তারা যেন মসজিদের আঙিনায় চলে আসে। তখন মোট ১০জন আনসার মসজিদে উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে একজন শারীরিকভাবে অক্ষমও ছিলেন। সেই অক্ষম ব্যক্তিও যখন অন্য আনসার ভাইদের সাথে বাহিরে যেতে উদ্যত হন তখন তাকে একথা বলে বসিয়ে দেওয়া হয় যে, তুমি কোনো কাজের নও, বসে থাকো। অবশিষ্ট ৯জনকে সাথে নিয়ে তারা মসজিদের আঙিনায় চলে আসে। মসজিদের আঙিনায় দাঁড় করিয়ে তারা ইমাম ইব্রাহীম বিদিগা সাহেবকে বলে, তিনি যদি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ইমাম সাহেব উত্তরে বলেন, আমার শিরশ্ছেদ চাইলে করো কিন্তু আমি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে পারব না। যে সত্য আমি পেয়ে গেছি তা থেকে পিছপা হওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়। ঈমানের বিপরীতে জীবনের কী মূল্য আছে?

সন্ত্রাসীরা তার গলায় ছুরি ধরে এবং তাকে শুইয়ে জবাই করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব তাচ্ছিল্যের সাথে বলেন, আমি শুয়ে মরার চেয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া পছন্দ করব। ফলেইমাম সাহেবকে তারা গুলি করে শহীদ করে।

সর্বপ্রথম শহীদ হন ইমাম আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব।

ইমাম সাহেবকে নৃশংসভাবে শহীদ করার পর সন্ত্রাসীরা মনে করে, বাকিরা হয়তো ভয় পেয়ে ঈমান থেকে পিছপা হবে। তাই তারা পরবর্তী আহমদী বুযুর্গকে বলে, তুমি আহমদীয়াত ছাড়বে নাকি তোমারও একই অবস্থা করব যা তোমাদের ইমামের করেছি ?

উত্তরে সেই বুযুর্গ অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বেও সাথে বলেন, আহমদীয়াত ছাড়া সম্ভব নয়। যে পথে চলে আমাদের ইমাম প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আমরাও সেই পথে চলব। তারপর তাকেও মাথায় গুলি করে শহীদ করা হয়।

পরে যারা ছিলেন তাদেরকেও এক এক করে একই কথা বলা হয় যে, ইমাম মাহ্ দীকে অস্বীকার করো এবং আহমদীয়াত পরিত্যাগ করো তাহলে তোমাদেরকে কিছুই বলা হবে না, জীবিত ছেড়ে দেওয়া হবে।

তখন উপস্থিত সকল আহমদী বুযুর্গ পর্বতসম অবিচলতা প্রদর্শন করেন এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শাহাদাতকে আলিঙ্গান করেন। কোনো একজনও সামান্যতম দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি আর আহমদীয়াতও পরিত্যাগ করেন নি। একের পর এক শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন কিন্তু কারো ঈমান দোদুল্যমান হয় নি। সবাই একে অপরের চেয়ে অধিক দৃঢ় ঈমান ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন এবং ঈমানের পতাকা উড্ডীন রেখে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেন।

প্রত্যেক শহীদকে কমবেশি তিনটি করে গুলি করা হয়েছে। এই ৯জন শহীদের মাঝে দুজন জমজ ভাইও ছিলেন। ৮জনকে শহীদ করার পর শেষে গিয়ে আগ উমর আগ আব্দুর রহমান সাহেব যার বয়স ছিল ৪৪ বছর তিনি বাকি ছিলেন। সকল শহীদের মধ্যে তিনি বয়সে সবার ছোট ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে, তুমি এখনো যুবক, আহমদীয়াত পরিত্যাগ করে নিজের জীবন বাঁচাতে পার। তখন তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে উত্তর দেন, যে পথ অবলম্বন করে আমার বুযুর্গেরা কুরবানী দিয়েছেন, যা সত্যের পথ; আমিও আমার ইমাম এবং বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণে ঈমানের খাতিরে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। ফলে তাকেও অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়।

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তায্কেরাতুশ্ শাহাদাতাইন পুস্তকের শেষের দিকে একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি (আ.) স্বপ্নের উল্লেখ করে লিখেন, 'খোদা তা'লা তার স্থলাভিষিক্ত অনেক লোককে সৃষ্টি করবেন।'

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৭৬)

তিনি তাঁর স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমি আশাকরি সাহেবযাদা সাহেবের শাহাদাতের পর আল্লাহ্ তা'লা তার স্থলাভিষিক্ত

অনেক লোককে সৃষ্টি করবেন।

আমরা সাক্ষী, আজ আফ্রিকার অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে এর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন আর 'স্থলাভিষিক্ত' হওয়ার দাবি পূরণ করেছেন। জঙ্গীদের মসজিদে আসা থেকে আরম্ভ করে প্রশ্নোত্তর করা, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা এবং পুরো কার্য সমাধা করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের হিসাব প্রায় দেড় ঘন্টা হয়। এই সময়ে শিশু কিশোর এবং অন্য সদস্যরা যে যন্ত্রণা ও কষ্টে পার করেছে তা সহজেই অনুমেয়। (কেননা) তাদের (চোখের) সামনে তাদের জ্যেষ্ঠদের শহীদ করা হচ্ছিল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে জঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায় নি বরং দীর্ঘক্ষণ মেহদিয়াবাদই অবস্থান করে। সশস্ত্র জঙ্গীরা মসজিদে উপস্থিত লোকদের এই হুমকিও দেয় যে, তোমরা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করো– এতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। আমরা আবারো আসব। তোমরা যদি আহমদীয়াত পরিত্যাগ না করো অথবা কেউ পুনরায় মসজিদ খোলার চেষ্টা করে তাহলে তোমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।

এই মেহদিয়াবাদ জামা'তের গোড়াপত্তন কবে হয়েছিল এবং এর পরিচিতি কী?

এ সম্পর্কে তারা লিখেছে, ১৯৯৮ সালের শেষদিকে এখানে রীতিমতো মিশন আরম্ভ করা হয়েছিল। জামা'ত দ্রুত উন্নতি করে। ১৯৯৯ সালে একটি গ্রাম তিকনেওয়েলের সংখ্যাগরিষ্ঠ (মানুষ) আহমদী হয়ে যায় এবং একটি নিষ্ঠাবান জামা'ত এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রামের ইমাম আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে অত্রাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ওহাবী ইমাম ছিলেন। তিনি অনেক গবেষণা করার পর বয়আত করেছিলেন। বয়আত করার পর একজন উদ্যমী দাঈ বা প্রচারক, একজন নির্ভীক মুবাল্লেগ এবং বীর সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আমি পূর্বে উল্লেখ করি নি, তিনি আরো বলেছেন, তিনি যখন বয়আত করেন তখন তার সঙ্গী কয়েকজন আলেম তাকে বলেন, তুমি কেন (আহমদীয়াত) গ্রহণ করছ? তিনি উত্তরে বলেন, আমি যখন স্বর্ণ দেখেছি এবং আল্লাহ্ তা'লা একে (গ্রহণ করার) নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস পূর্ণ হচ্ছে, কথাও পূর্ণ হচ্ছে, পবিত্র কুরআন এর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাই এখন আমি এটি অস্বীকার করব আর (এ থেকে) বঞ্চিত থাকব তা কীভাবে সম্ভব!

যাহোক, ইমাম সাহেব অনেক একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। এই গ্রামের সব মানুষ তামাশিক গোত্রের সদস্য এবং তামাশিক ভাষায় কথা বলে। তামাশিক লোকদের সংখ্যা দুই লক্ষের কাছাকাছি বলা হয়ে থাকে। এরা বুরকিনা ফাসো, নাইজার, মালি এবং আলজেরিয়াতে বসবাস করে। (এদের) ৯৯.৯% মুসলমান। এদের অধিকাংশই কট্টর ওহাবী বিশ্বাস পোষণ করে। তামাশিক লোকদের মাঝে আহমদীদের সংখ্যা খুব বেশি নেই, তবে বুরকিনা ফাসোতে মেহদিয়াবাদের তামাশিক বাসিন্দারা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর বয়আত করার ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। আর এখন এত বড় কুরবানী দিয়ে নিজেরা একটি বিশেষ মর্যাদাও অর্জন করে নিয়েছে।

২০০৪ সালে অত্রাঞ্চলে স্বর্ণের অনেক বড় বড় খনি আবিষ্কৃত হলে মাইনিং কোম্পানী এই গ্রামের বাসীন্দাদের নিকটস্থ একটি নতুন স্থানে ঘরবাড়ি বানিয়ে দিয়ে বলেছে, সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যান। এসব স্থানান্তরিত লোকের একটি বড় অংশ ছিল আহমদী। অল্প কয়েকটি পরিবার ছিল অন্যদের। নতুন গ্রাম বানানো হয়েছিল যা (বলতে গেলে) প্রায় আহমদীদেরই গ্রাম ছিল। ইব্রাহীম সাহেব প্রস্তাব দেন, এই গ্রামের নাম পুরোনোটা আর রাখব না। তিনি আমাকে লিখেন, আপনি (আমাদের) এই গ্রামের একটি নাম রেখে দিন। এরপর এর নাম মেহদিয়াবাদ রাখা হয়। ২০০৮ সালে এখানে IAAAE (International Association of Ahmadi Architects & Engineers) এর অধীনে মডেল ভিলেজ বা আদর্শ গ্রাম নির্মাণ করা হয়। পানি, বিদ্যুতের সুবিধা প্রদান করা হয়।এটি বুরকিনা ফাসো বরং সমগ্র বিশ্বের প্রথম মডেল ভিলেজ প্রজেক্ট ছিল। এর অধীনে গ্রামে বিদ্যুৎ, পানি, সেলাই স্কুল ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শহীদদের দাফনের ব্যাপারে তারা তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, জঙ্গীরা মসজিদে দেড় ঘন্টা অতিবাহিত করে এমন ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, যে স্থানে শাহাদাত হয়েছিল সেখানেই শহীদদের লাশগুলো সারারাত পড়ে ছিল। কেননা আশঙ্কা ছিল জঙ্গীরা (এখনো) গ্রামের বাইরে যায় নি আর যদি কেউ লাশ উঠানোর চেষ্টা করে তাহলে তাকেও মেরে ফেলা হবে। নিকটেই সেনা ক্যাম্প ছিল। এই ঘটনার সংবাদ তাদেরকে দেওয়া হয় কিন্তু সেখান থেকেও কেউ আসে নি আর সকাল পর্যন্ত নিরাপত্তা বিভাগের কোনো সদস্যও পৌঁছে নি। এরপর ১২ জানুয়ারি সকাল ১০টায় মেহদিয়াবাদে শহীদদের সমাহিত করা হয়।

এখন আমি তাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করছি।

আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব, যিনি ইমাম ছিলেন, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, শাহাদত বরণের সময় তার বয়স ছিল ৬৮ বছর। শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবেও অবস্থান করেছেন। তামাশিক ভাষার অনেক বড় আলেম ছিলেন এবং এই ভাষায় পবিত্র কুরআনের তফসীরকারকও ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালে বয়আত করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে ইমাম ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব অনেকগুলো গ্রামের প্রধান ইমাম ছিলেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন আলেম তার পাশে এসে বসা এবং জ্ঞানার্জন করাকে নিজেদের জন্য সম্মানের কারণ মনে করত। অতএব প্রত্যেক বছর কমপক্ষে একবার অত্রাঞ্চলের আলেমওলামা, মুয়াল্লেমীন এবং ইমামেরা তার নিকট এসে অবস্থান করে কল্যাণমণ্ডিত হতেন। এদের সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত পৌঁছে যেত এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থান করতেন। বলা যায়, অত্রাঞ্চলের আলেমওলামা ও ইমামদের বার্ষিক সভা তার বাড়িতেই হতো। তার একজন শিষ্য বর্ণনা করেন, সেই দিনগুলোতেও ইমাম সাহেব প্রায়শই একথা বলতেন যে, এখনো সত্য প্রকাশিত হয় নি; কেননা সত্যের মান্যকারীরা স্বল্প হয়ে থাকে। যেভাবে শত শত সংখ্যায় এই ইমামরা অ ামার নিকট এসে বসে এবং বাহ্যত একে অপরকে মুসলমান জ্ঞান করে, কিন্তু যখন সত্য প্রকাশিত হবে তখন মান্যকারীর সংখ্যা স্বল্প হবে, (তখন) এরাও আমার কাছ থেকে উঠে চলে যাবে।

পুণ্য ছিল, তাকওয়া ছিল, জ্ঞান ছিল, তাই যুগের নিরিখে ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, সত্য প্রকাশিত হবে এবং এরপর যেভাবে সর্বদা নবীদের বিরোধীদের রীতি রয়েছে (সে অনুসারে) এরাও বিরোধিতা করবে।

যাহোক তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন, সত্য এলেই আমি মেনে নিব। ১৯৯৮ সালে ডোরিতে রীতিমত আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইমাম ইব্রাহীম সাহেবের নিকটও এর সংবাদ, অর্থাৎ আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে। তবলীগি কার্যক্রমের সময় একটি বাজারে আলহাজ্ব বিদিগা সাহেব প্রথম আহমদীয়াতের নাম শুনেছিলেন। তিনি জানতে পারেন, আহমদীরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী এবং মসীহ্ ও মাহ্দীর আগমনের সংবাদ প্রদান করে থাকে। তখন ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে সত্যের সন্ধানে ডোরি মিশন হাউজে আসেন। অনেক গবেষণার পর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। নিজ অঞ্চলে প্রথম আহমদী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এই যে বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে, এরা দরিদ্র মানুষ, (অর্থের) প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বয়আত করায়, তারা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না, এই শহীদরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ভালোভাবে বুঝে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে কুরবানীরও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

যাহোক, ইব্রাহীম সাহেব সম্পর্কে আরো লিখেছেন, পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জামা'তের একজন নির্ভীক সৈনিক ছিলেন। সাহসী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন আর সত্যিকার অর্থেই একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। তার তবলীগি চেষ্টা-প্রচেষ্টায় গোটা অঞ্চলে আহমদীয়াতের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। অনেকগুলো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সর্বাগ্রে বিভিন্ন জামা'তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার বিশ্বাস অনুযায়ী ওহাবী ছাড়া অন্য সকল ফির্কাই কাফের ছিল। টিভি দেখা, ফুটবল খেলা বা দেখা, স্কুলে যাওয়া, চিত্রাঙ্কন করা– এসব কাজই তার মতে হারাম ছিল, যেমনটি ওহাবীদের ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু এরপর তিনি যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন এসব অহেতুক ধ্যানধারণা হতে নিজেকে মুক্ত করেন এবং লোকদেরও বুঝান যে, প্রকৃত সত্য কী। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে ২০০০ সালে এখানে যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণেরও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেন। তবলীগ করার ক্ষেত্রে তার উন্মাদনা ছিল।

আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বেও (একজন) প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেকগুলো গ্রামের প্রধান ইমাম ছিলেন, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে। (আর) আহমদীয়াত গ্রহণের পর নিজেকে তি নি তবলীগের জন্য উৎসর্গ করে দেন। এমন মনে হতো যেন তার অন্য কোনো কিছুর পরোয়াই নেই। তিনি তবলীগের হোয়াটসএ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে রেখেছিলেন যাতে বিশেষত তামাশিখ লোকদের জন্য একটি গ্রুপ ছিল। এই গ্রুপে মালি, নাইজার, ঘানা, সৌদি আরব, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আইভরি কোস্ট ইত্যাদি দেশ থেকে মানুষ যোগ দিত। অনবরত তাদেরকে তবলীগ করতেন। দিনরাত অডিও বার্তা রেকর্ড করে প্রেরণ করতে থাকতেন। দিন হোক বা রাত, এই কাজেই মগ্ন থাকতেন। উত্তরে বিরোধীরা তাকে গালিগালাজের বার্তাও পাঠাত। সেখানেও বিরোধিতা হতো। তাকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো। কিন্তু তিনি কখানো কারো সাথে রেগে কথা বলতেন না। বরং যারা হত্যার হুমকি দিত তাদেরকে তিনি বলতেন, আমি তোমাকে (যাতায়াতের) ভাড়া পাঠাচ্ছি, এসে আমাকে হত্যা করে যাও।

মুবাল্লেগ এবং মুয়াল্লেমদেরও তিনি বলতেন, তবলীগ করা উচিত। পরিস্থিতি ভালো নয়, তাই আমরা তবলীগি সফরে যেতে পারব না– এটি একটি অজুহাত মাত্র। অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে (তখন)। তিনি বলেন, মিডিয়ার মাধ্যমে তবলীগ করুন। আর যদি কারো কাছে ফোনে ইন্টারনেট প্যাকেজ নেওয়ার মতো অর্থ না থাকে তাহলে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন আর সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ বানিয়ে ঘরে বসে তবলীগের জিহাদে অংশ গ্রহণ করুন। এক প্রকার উন্মাদনা এবং এক বিশেষ আগ্রহ ছিল তার।

নাসের সিন্ধু সাহেব এখানে মুরব্বী ছিলেন, তিনি বলেন, ১৯৯৭ সনে বুরকিনা ফাসো এসেছি। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি ভাষা জানতাম না, তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে তিন মাস সময় লেগে যায়। এরপর বিভিন্ন গ্রামে সফর করি। তাদের কাছে এই গ্রামের ইমামের কাছেও যাই। তিনি যখন এই সংবাদ পান যে, অর্থাৎ ঈসা (আ.)–এর মৃত্যু এবং মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সংবাদ, তখন ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব ৭জন লোক সাথে নিয়ে ডোরিতে আমাদের মিশন হাউজে আসেন। সেখানে প্রশ্নোত্তর হয়। তিনি বলেন, তিন দিন তিনি আমার কাছে অবস্থান করেন। এই তিন দিন তিনি নিজেও ঘুমান নি আর আমাকেও ঘুমাতে দেন নি। এরপর তারা চলে যান। প্রতিদিন সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলোচনা হতো। পরের সপ্তাহে তিনি পুনরায় আসেন এবং তাদের নতুন ইমামকে নিয়ে আসেন আর অনুসন্ধানের এই ধারা তিন মাস পর্যন্ত চলমান থাকে। তার কাছে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর চলে এসেছিল কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের কথা তিনি কখনো বলেন নি। তিনি বলেন, যাহোক আমি খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে দোয়ার জন্য (পত্র) লিখতে থাকি। একদিন ইমাম সাহেব আসেন আর বয়আতের ফরম পূরণ করে দেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি, বাকি যারা (এতদিন) নিয়মিত এসেছেন তারা কোথায়? তারা কখন (আহমদীয়াত) গ্রহণ করবে? তখন তিনি বলেন, তারা সবাই গ্রহণ করবে কিন্তু সর্বপ্রথম আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি চলে এসেছি।

খিলাফতের প্রতিও তিনি গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন।

বুরকিনা ফাসো জামা'তের আমীর সাহেব লিখেন, ৪৫টির মতো গ্রাম তার প্রভাবাধীন ছিল। তিনি হজ করেছেন। সেখানে থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। খুব ভালো আরবী জানতেন এবং বলতে পারতেন আর এই পুরো অঞ্চলে অনেক তবলীগ করেছেন। সাইকেলে করে গ্রামে গ্রামে যেতেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্র অঞ্চলে বহু মানুষকে আহমদীয়াতের নূরে নূরান্বিত করেছেন। তার মাধ্যমে এই এলাকার বড় বড় আলেম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর (এই) এলাকার অধিকাংশ জামা'ত তার তবলীগের কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখনই লন্ডন আসা হতো তখন সর্বদা জিজ্ঞেস করতেন, যুগ খলীফা কেমন আছেন? খুবই ভালোবাসা প্রকাশ করতেন।

তিনি বলেন, এই ভালোবাসার একটি উদাহরণ হলো, এমটিএ-তে শিশুদের সাথে আমার যে ক্লাস হতো, উর্দু ভাষার কিছুই না জানা সত্ত্বেও অতন্ত নিমগ্নচিত্তে তা দেখতে থাকতেন যেন বুঝতে পারছেন। এছাড়া কেবল একথাই বলতেন যে, আমার জন্য এখানে এই সভায় বসে এ অনুষ্ঠান দেখাই আমার ঈমানে অনেক উন্নতির কারণ হয়।

অতিথিপরায়ণ ও নীরব প্রকৃতির (মানুষ) ছিলেন, কিন্তু জামা'তের প্রয়োজনে কিছু বলার প্রয়োজন হলে খুবই আবেগের সাথে কথা বলতেন। একজন পুরোদস্তুর মুবাল্লেগ ছিলেন। অ–আহমদীদের সাথে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে তিনি অনেক ধর্মীয় বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর করেছেন।অতঃপর সেখানকার আরেকজন মুরব্বী মুহিবুল্লাহ্ সাহেব বলেন, এসব বুযুর্গকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, কেননা সেখানে আমি প্রায়শ যাতায়াত করতাম। তারা খিলাফতের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা পোষণকারী, অতিথিপরায়ণ ও বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। তিনি বলেন, সব যুবকেরা যখন সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকত তখন এই বুযুর্গেরা মসজিদের সামনে ছাউনি দেওয়া জায়গায় বসে এমটিএ দেখতেন। তিনি বলেন, তারা শহীদ হওয়ার অব্যবহিত পর আমার নিকট এক যুবকের ফোন আসে যে, এভাবে আমাদের বুযুর্গদের শহীদ করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল যদি আপনারা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন তাহলে আমরা আপনাদের ছেড়ে দিব, কিন্তু তারা শাহাদাত বরণকেই প্রাধান্য দেন, এই যুবক একথাই বলেছে। এই যুবকের ভাষ্য ছিল, এরা যদি আমাদের সবাইকে শহীদ করে তবুও আমরা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করব না। এই যুবক ছেলেটি বলে, এখানে তো কেবল ৯জন আনসার ছিলেন, যদি আমাদের সব খোদ্দাম এবং লাজনাদেরকেও শহীদ করে তবুও আমরা আহমদীয়াত ছাড়ব না, ইনশাআল্লাহ্। এটি হলো এই জামা'তের উক্ত নিষ্ঠাবান সদস্যদের প্রেরণা যা তারা (নিজেদের মাঝে) সৃষ্টি করেছেন। যখন বড়দের তরবিয়ত থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত থাকে তখনই যুবক ও নারীদের মাঝে এরূপ প্রেরণা ও ঈমান সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় মুবাল্লেগ মায়েগা তেজান সাহেব বলেন, ইমাম ইব্রাহীম সাহেবকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছিল। শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে তিনি আমাকে বলেন, আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। তার উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে তিনি বলেন, নিজ পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে খুবই উত্তম আচরণ করতেন। সবার সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করা তার অভ্যাস ছিল। অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং ত্যাগের স্পৃহা দেখানো তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজ এলাকার অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষ তাকে খুবই শ্রদ্ধা করত।

ইব্রাহীম সাহেব কোনো সিদ্ধান্ত দিলে অথবা কোনো কথা বললে মানুষ সেটির সম্মান করত এবং তা মেনে নিত। তার শিষ্যের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে থেকে কতক অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে ইমাম ও মুয়াল্লেম হিসেবে কাজ করছে। বুরকিনা ফাসোতেও অনেকেই মুয়াল্লেম এবং স্থানীয় মিশনারী হিসেবে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, পুণ্য, তাকওয়া এবং সৎকর্মে অগ্রগামী থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য আদর্শ ছিলেন।

যখনই জামা'তের সদস্যদের জন্য কোনো তাহরীক করতেন তখন সর্বপ্রথম নিজে তাতে অংশগ্রহণ করতেন। আর্থিক কুরবানীর কোনো তাহরীক হলে সবার আগে নিজে (তাতে) অংশ নিতেন। জামা'তের বিভিন্ন কাজ, জলসা, ইজতেমা এবং অন্যান্য প্রোগ্রামে (অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে) কখনো পিছিয়ে থাকেন নি। পাঁচ বেলার নামাযই তিনি মসজিদে এসে পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। কখনো কোনো জামা'তী অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে এর অর্থ হচ্ছে হয় তিনি অসুস্থ নতুবা সফরে আছেন। জামা'তী কাজে অংশগ্রহণের জন্য কখনোই তিনি খরচের পরোয়া করতেন না। তিনি দুটি বিয়ে করেছিলেন, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ১১জন সন্তান দান করেছেন।

মুরব্বী খালেদ মাহমুদ সাহেব লিখেন, তারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। খিলাফতের প্রেমিক এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, ২০০৮ সনে যখন আমার সফর হয়েছিল, খিলাফত শতবার্ষিকীর বছর ছিল, আমি ঘানায় সফরে গিয়েছিলাম এবং জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন বুরকিনা ফাসো, মালি প্রভৃতি দেশ থেকেও হাজার হাজার আহমদী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ঘানা জামা'ত আতিথেয়তা ও আবাসনের ভালো ব্যবস্থাই করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ডোরি থেকে আগমনকারী কিছু লোক যাদের মাঝে এরাও (অর্থাৎ শাহাদত বরণকারীরাও) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাবার পেতে বিলম্ব হয় অথবা তারা খাবার পান নি। এরপর রাতে অনেক দেরীতে বাজার থেকে (খাবার) এনে তাদের দেয়া হয়। এতে আমি সেই মুরব্বী সাহেবকে যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলেছিলাম, তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং তাদের মনস্তুষ্টি করবেন। তিনি বলেন, তাৎক্ষণাৎ আমি তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অথবা আপনার বার্তা যখন তাদের কাছে পৌঁছে দিই তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আলহাজ্ব ইব্রাহীম সাহেব । একই সময়ে তিনি বাকি লোকদের সাথে বলেন, আমরা এখানে এসেছিলাম যুগ খলীফাকে দেখতে এবং তাঁ ার সাথে সাক্ষাৎ করতে। তাই তাঁকে দেখেএবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের পরই আমাদের ক্লান্তি ও ক্ষুধা দূর হয়ে গেছে, আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। বরং আমরা তো একত্রে বসে এই সাক্ষাৎ নিয়েই কথা বলছি এবং এর স্বাদ উপভোগ করছি। যাহোক, তখন আমারও চিন্তা ছিল যে, এত দীর্ঘ সফর করে এসেছেন, অনেকে তখন সাইকেলে করেও এসেছিলেন আর তাদের ব্যবস্থা হয় নি। তাই দ্রুত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অপরদিকে তাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এরূপ ছিল যে, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তখনও আমি তাদের এ সংবাদই পেয়েছিলাম আর তখনও আমি বিস্মিত ছিলাম যে, এরা কেমন দৃঢ় ঈমানের মানুষ!

মুয়াল্লেম আলহাজ্ব মাহমুদ ডিকো সাহেব বলেন, শরীফ ওদে সাহেব বেনিন সফরে আসেন। তখন ইমাম সাহেব বুরকিনা ফাসো থেকে বাসে করে রাতের বেলা এক হাজার কিলোমিটার সফর করে ভোর ৩টায় সেখানে পৌঁছেন। ৩০ ঘন্টার ক্লান্তিকর সফর ছিল, সেখানকার রাস্তাও ভালো না, তথাপি তিনি বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। পরে আরো দীর্ঘ সফর করার ছিল, সেটিও তিনি তাদের সাথে করেছেন এবং সব প্রোগ্রামেও অংশগ্রহণ করেছেন।

তার মাঝে জামা'তের সেবা করার এক উদ্দীপনা ছিল। বেনিনে বিভিন্ন মসজিদ দেখে খুব খুশি হতেন এবং বলতেন, দেখো! এটিও তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সত্যতার একটি প্রমাণ। অনুরূপভাবে অ–আহমদীদের সাথে যে বিতর্ক হতো সেখানে তিনি আরবীতে খুবই জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা করতেন। শরীফ ওদে সাহেবের সাথেও মৌলবীদের

বিতর্ক হচ্ছিল। তখন তারা কোনো বাজে কথা বলে বসলে তিনি রাগ করে উত্তর দিতে উদ্যত হন কিন্তু তাকে চুপ করতে বললে সাথে সাথেই তিনি বসে পড়েন। এরপর অ-আহমদীরা বলে, তোমরা যদি আমাদেরকে মুসলমানই মনে করো তবে আমাদের পেছনে নামায পড়ো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, যারা আমাদেরকে কাফের বলে এবং যুগ ইমামকে গ্রহণ করে না এটি কীভাবে সম্ভব যে, আমরা তাদের পিছনে নামায পড়ব। তাহলে এটি মেনে নাও যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যুগ ইমাম তবে আমরা নামায পড়ব।

বেনিনের একজন অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় মুয়াল্লেম বলেন, তিনি যুগ খলীফার প্রতি ভালোবাসার এক বাস্তব চিত্র ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি যখন পাকিস্তানি মুবাল্লেগের কাছ থেকে আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলাম সেদিন থেকেই আহমদী হয়ে গিয়েছি। আমি এটি শিখেছি যে, জগদ্বাসীর কল্যাণ শুধুমাত্র খিলাফত ব্যবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত এবং এটিই প্রকৃত পথ আর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, তিনি যা বলেছিলেন তা সত্যিকার অর্থেই করে দেখিয়েছেন।

এরপর বেনিনের স্থানীয় মুয়াল্লেম ঈসা সাহেব বলেন, তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল। তিনি এমন একজন আহমদী ছিলেন যার সাথে কারোই কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি সত্যিকার আহমদী ছিলেন, এরূপ আহমদী যিনি সকল পুণ্যকর্মে অগ্রগামী ছিলেন। তবলীগ করা, চাঁদা দেওয়া সর্বক্ষেত্রে প্রথম (সারিতে) ছিলেন। তাঁর কারণেই বাকি ৮জন আনসারও তাঁর পিছনে লাব্বাইক বলে খোদার সমীপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গকারী হয়ে গিয়েছেন।

বুরকিনা ফাসোর জামেয়ার প্রিন্সিপাল সাহেব লিখেন, কোনো ব্যক্তি একটি স্বপ্ন দেখে। এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) জামা'তের আমীর সাহেবকে একথা লিখে পাঠান যে, এটি একটি শুভ স্বপ্ন আর এর অর্থ হলো, দেশের মাটি সত্য গ্রহণের জন্য উর্বর আর আমার সফরের পর ইনশাআল্লাহ্ সত্য গ্রহণ করে (মানুষ) নূরে নূরান্বিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ করুন, এমনই যেন হয়। (এডিশিনাল ওয়াকিলুত তবশীর, ১৯জুন, ১৯৯০)

আমার জানা মতে, (পরে) সেখানে আর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সফর হয় নি। আমি সেখানে ২০০৪ সালে সফরে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এরপর আপনিও লিখেছিলেন যে, আমার পূর্ণ বিশ্বাস বুরকিনা ফাসোর মাটিতে আহমদীয়াতের যে বীজ বপন করা হয়েছে তা অতি দ্রুত স্থায়ী ফল দিবে।

বুরকিনা ফাসোর মানুষ আসলেই অনেক বড় মাপের মানুষ আর আমি আনন্দিত এই কারণে যে, খোদা তা'লা তাদেরকে আহমদীয়াতের নূরে নূরান্বিত করেছেন। আমি বুরকিনা ফাসো জামা'তের সদস্যদের মাঝে যে জাগরণ দেখেছি তা ছিল অবাক করার মত। আমি আশা রাখি, আগামী দু ই-তিন বছরে এই সফরের সুমহান ফল প্রকাশ পাবে আর জামা'ত দ্রুত উন্নতি করবে ইনশাআল্লাহ্। (এডিশিনাল ওয়াকিলুত তবশীর, ১ লা মে, ২০০৪)

আমি আমার সফরের পর তাদেরকে এটি লিখেছিলাম। আফ্রিকার জামা'তগুলোর মধ্যে বুরকিনা ফাসোর আহমদীদের মাঝে আমি এক বিশেষ গুণ লক্ষ্য করেছি আর তা হলো, সাক্ষাতের সময় সবাই আমার সাথে কোলাকুলি করার চেষ্টা করত। এছাড়া তাদের ভালোবাসার যে বহিঃপ্রকাশ তা-ও দেখার মতো ছিল। প্রিন্সিপাল সাহেব লিখেন, আজ মেহদিয়াবাদের নিষ্ঠাবান আহমদীরা তাদের অসাধারণ কুরবানী প্রদানের মাধ্যমে আপনার লেখা "সত্যিই অনেক বড় মাপের মানুষ" এই বাক্যের ওপর সত্যায়নকারী মোহর লাগিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয়জন হলেন আল হাসান আগমালি আয়েল সাহেব। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭১ বছর। পেশার দিক থেকে তিনি কৃষক ছিলেন। ১৯৯৯ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। গ্রামের প্রারম্ভিক আহমদীদের মাঝে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইব্রাহীম সাহেবের সাথে ডোরি মিশনে যাওয়া অনুসন্ধিৎসু দলে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বয়আত করার পর থেকেই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় উন্নতি করতে থেকেছেন। খিলাফতের সাথে খুব নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। বাজামা'ত নামায আদায়কারী, তাহাজ্জুদগুযার, চাঁদায় নিয়মিত (ছিলেন এবং) নিজ পরিবারের জন্য পশ্চাতে এক উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সার্বিকভাবে তিনি যে জামা'তের জন্য প্রাণ, সম্পদ এবং সময়ের কুরবানী করেছেন তা ছিল অসাধারণ। তিনি বুরকিনা ফাসোর স্থানীয় ৪/৫টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এর ফলে পুরো দেশের জামা'তগুলোতেই তাঁর বন্ধু -বান্ধব ছিল। ভাষা জানার কারণে জলসা সালানায় অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা লোকদের সাথে একদম মিশে যেতেন। লোকেরা তাঁকে খুব পছন্দ করত, তাঁর বৈঠকে বসে সবাই আনন্দ পেত। জামা'তের পক্ষ থেকে যখনই কোনো তাহরীক করা হতো তাতে তিনিই সর্বাগ্রে অংশগ্রহণ করতেন। বিগত বছর জামা'তের পক্ষ থেকে ওয়াকফে আরযীকরার তাহরীক হয়। তখন মেহদিয়াবাদ জামা'ত থেকে তিনি সর্বপ্রথম নাম লিখান। মেহদিয়াবাদেরএই মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁর জমজ ভাই জনাব হুসাঈন আগমালি আয়েল সাহেবও শাহাদাত বরণ করেন।

হুসাঈন আগমালি আয়েল সাহেব যিনি তাঁর (তথা আল হাসান আগমালি আয়েল সাহেবের)জমজ ভাই। যেভাবে বলা হয়েছে যে, জামজ ভাই; (তাই) তাঁর বয়সও ৭১ বছর ছিল। তিনিও ১৯৯৯ সালে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এভাবে তিনিও নিজ গ্রামের প্রারম্ভিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আলহাজ্ব ইব্রাহীম সাহেবের সাথে ডোরি মিশন হাউজে গিয়ে অনুসন্ধানকারী দলেতিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইদানিং তিনি মেহদিয়াবাদে আনসারুল্লার যয়ীম হিসেবে দায়িত্ব পালনেরসৌভাগ্য পাচ্ছিলেন। আনসার ভাইদের তিনি উত্তমরূপে সুসংগঠিত করার যোগ্যতা রাখতেন। তাদেরকে জামা'তের বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং কাজে সক্রিয় রাখতেন আর তরবিয়তের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করাতেন। মসজিদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য জায়গায় ওয়াকারে আমল বা স্বেচ্ছাশ্রম করাতেন। বিভিন্ন চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা এবং পাঁচ বেলার নামায মসজিদে গিয়ে পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। এছাড়া নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। মেহদিয়াবাদের মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁর জমজ ভাইও শহীদ হয়েছেন; পূর্বেও এর উল্লেখ হয়েছে। একই দিন পৃথিবীতে এসেছেন আর একই দিনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

হামিদু আগ আব্দুর রহমান সাহেব, (মৃত্যুকালে) তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর। পেশায় তিনিও একজন কৃষক ছিলেন। তিনিও ১৯৯৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অত্যন্ত পরিষ্কার হৃদয়ের অধিকারী এবং সহিষ্ণু মানুষ ছিলেন। সর্বদা জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে থাকতেন। কোনো অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে মনে করা হতো যে, হয় একান্ত অপারগতা রয়েছে নয়তো তিনি অসুস্থ আছেন অন্যথায় তিনি অনুপস্থিত থাকতেন না। তিনি ছিলেন ইমাম ইব্রাহীম সাহেবের সাহায্যকারীদের অন্যতম। নিজ পরিবারকেও জামা'তের নেযাম তথা ব্যবস্থাপনারসাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য এবং জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতে সর্বদা উপদেশ প্রদান করতেন। খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে একান্ত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘ সময় মসজিদে কাটাতেন, এমটিএ-তে অনুষ্ঠান দেখতেন। বিশেষত খুতবা রীতিমত এবং গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

সুলেহ্ আগ ইব্রাহীম, শাহাদাতকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর। পেশায় তিনিও একজন কৃষক ছিলেন। বাজামা'ত নামাযের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন এবং রীতিমত চাঁদা দিতেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্র একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। ইব্রাহীম সাহেবের ডান হাত ছিলেন এবং সাহায্যকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জ্ঞানী মানুষ ছিলেন আর ধর্মীয় কিংবা জ্ঞানগর্ভ আলাপ-আলোচনা করা তাঁর অভ্যাস ছিল। জামা'তের আনসারদের মাঝে যখনই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো তখন তাঁকে এমন আসরে পাওয়া যেত। অত্যন্ত সহিষ্ণু ও সৎপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে সদ্ব্যবহার করা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। সালানা জলসা কিংবা ইজতেমায় যাওয়ার সময় যদি তিনি লক্ষ্য করতেন যে, কারো কাছে যাতায়াত ভাড়া নেই অথবা পর্যাপ্ত অর্থ নেই সেক্ষেত্রে তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন যেন সেও অংশগ্রহণ করতে পারে। সাম্প্রতি, অর্থাৎ এ বছর ডোরি এলাকা থেকে বেরিয়ে সফর করা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ ছিল , কেননা সন্ত্রাসীরা সর্বোত্র ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল কিন্তু বিরাজমান শত বিপদসংকুল পরিবেশ সত্ত্বেও মাহদীয়াবাদ থেকে সফর করে বুরকিনাফাসোতে গিয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন।

পরের জন হলেন উসমান আগ সুদে সাহেব। (শাহাদাতকালে) তাঁর বয়স ছিল ৬৯ বছর।নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। জামা'তের জন্য অর্থ ও সময় উৎসর্গকারী ছিলেন এবং পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা প্রাণ বিসর্জনেরও তৌফিক দান করেছেন। মেহদিয়াবাদের মসজিদ নির্মাণকালে পানি বহন করে নিয়ে আসতেন আর নির্মাণকাজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা করেন এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নিয়মিত নামায পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। রীতিমত চাঁদা দিতেন। যা-ই আয় করতেন তা থেকে সর্বপ্রথম চাঁদার অর্থ প্রদান করতেন। এমন মানসিকতার মানুষ কি অর্থের লোভে বয়আত করে, যেমনটি বিরোধীরা বলেছে? পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।জুতার ব্যাবসা করতেন। কারো জুতা কেনার সামর্থ্য না থাকলে অথবা পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলেও তাকে শূন্যহাতে যেতে দিতেন না। কাউকে খালি পায়ে ফিরিয়ে দিতেন না। কারো কাছে অর্থ না থাকলে অথবা পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে তিনি বলেতেন, কোনো সমস্যা নেই, পরে দিলেও চলবে।

আরেক জন হলেন আলী আগ মাগোয়েল সাহেব। তিনি ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে ১৯৯৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ

করেন। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বিল্লারের মুয়াজ্জেন ছিলেন। সন্ত্রাসবাদের কারণে কিছুদিন পূর্বে তাকে নিজ গ্রাম থেকে বসতবাড়ি স্থানান্তরিত করতে হলে তিনি মেহদিয়াবাদে এসে বসতি স্থাপন করেন। খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। বিভিন্ন নামায এবং চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত ছিলেন। এছাড়া জামা'তের সকল কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন।

পরের জন হলেন মূসা আগ আদরাহি। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ৫৩ বছর। তিনিও কৃষিকাজ করতেন। জামা'তের বিভিন্ন কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। আহমদী হওয়ার পূর্বে তিনি ওহাবী ফিরকার অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলেন। (ফরয) নামাযগুলোতে তিনি খুবই নিয়মিত ছিলেন এবং তাহাজ্জুদ নামাযও রীতিমতো পড়তেন। মাগরিবের নামাযের জন্য মসজিদে এসে এশার নামায পড়েই বাড়ি ফিরতেন। মাগরিব ও এশার সময় মসজিদে অবস্থান করতেন এবং যিকরে এলাহীতে মগ্ন থাকতেন। তার সম্পর্কে সবাই এ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি একজন সত্যিকার মু'মিন এবং একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী হওয়ার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ছিলেন। আমার কাছে তিনি নিয়মিত দোয়া চেয়ে চিঠি লিখতেন আর বলতেন, আমিও যুগ-খলীফার জন্য নিয়মিত দোয়া করে থাকি।

নবম জন হলেন, আগ উমর আগ আব্দুর রহমান সাহেব। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ৪৪ বছর। তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। যেভাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সনে ২০ বছর বয়সের তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এরপর জামা'তের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থেকেন। মেহদিয়াবাদ জামা'তের খুবই নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ একজন সদস্য ছিলেন। ইমাম ইব্রাহীম সাহেবের ডান হাত ছিলেন। মেহদিয়াবাদ (মসজিদ)-এর সহকারী ইমামও ছিলেন। মসজিদে প্রবেশের পর সন্ত্রাসীরা ইমাম ইব্রাহীম সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জিজ্ঞেস করে,নায়েব ইমাম কে? তখন নির্দ্বিধচিত্তে তিনি বলেন, আমি (নায়েব ইমাম)। যেসব লোক মসজিদে প্রথম আসে সর্বদা তিনি তাদের একজন হতেন। তিনি খুবই ধীরেসুস্থে ও আন্তরিকতার সাথে নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামাযেও অভ্যস্ত ছিলেন। ছেলেমেয়েকেও নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং তাদের তরবিয়তের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনিও আমার কাছে নিয়মিত পত্র লিখতেন। সাইকেল চালনায় খুব দক্ষ ছিলেন আর গোটা অঞ্চলে বড় বড় সফর করতেন। ডোরি থেকে তিনি চার বার ২৬৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ওয়াগাডোগুতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। ২০০৮ সনে খিলাফত জুবলীর জলসা উপলক্ষ্যে বুরকিনা ফাসো থেকে যে কাফেলা সাইকেল চালিয়ে ঘানা গিয়েছিল তাতে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রত্যেক নামের সাথে যে 'আগ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে তাদের রিপোর্ট থেকে আমি যা বুঝেছি তা হলো এর অর্থ ইবন, অর্থাৎ অমুকের পুত্র। আগ অমুক অথবা অমুক ব্যক্তি তমুকের পুত্র কিংবা ইবনে অমুক। যাহোক তার সম্পর্কে আরো লিখেছেন, ৮জনকে শহীদ করার পর শেষে আগ উমর আগ আব্দুর রহমান সাহেব রয়ে যান। বয়সের দিক থেকে তিনি (তাদের মধ্যে) সবচেয়ে ছোট ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে, তুমি যুবক মানুষ, তুমি (চাইলে) আহমদীয়াত অস্বীকার করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পার। কিন্তু অত্যন্ত সাহসিকার সাথে তিনি তাদের বলেন, আমার বয়োজ্যেষ্ঠরা যে পথ ধরে জীবন উৎসর্গ করেছেন আমিও আমার ইমাম ও বয়োজ্যেষ্ঠদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈমানের খাতিরে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। একথা শুনে তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে মুখমণ্ডলে গুলি করে শহীদ করা হয়।

বুরকিনা ফাসোতে সার্বিকভাবেই পরিস্থিতি খারাপ। সন্ত্রাসীরা অনেক অঞ্চলেই তাণ্ডব চালিয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্বে দ্বীনিয়া মজলিসের কায়েদ সাহেব কেন্দ্র তথা মিশন হাউজে এসে বলেন, গ্রামে আমার মুদিখানা রয়েছে। একদিন সন্ত্রাসীদের একজন তার দোকানে আসে [এটি পুরোপুরি ভিন্ন একটি অঞ্চল] আর সে কিছু ক্রয় করতে আসে। সে এদিক সেদিক দেখছিল। সেখানে তার দোকানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি ঝোলানো ছিল। সে কায়েদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, এরা কারা? দোকানে তুমি কাদের ছবি ঝুলিয়ে রেখেছ? তখন কায়েদ সাহেব উত্তর দেন, এগুলো মসীহ্ মওউদ এবং তাঁর খলীফাদের ছবি। সে বলে, মসীহ্ মওউদ না, বরং মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক একজোট হয়ে একটি দল বানিয়েছে, এরাই সেসব লোক আর এরা কাফের। যাবার আগে কায়েদ সাহেবকে হুমকি দিয়ে বলে, এসব ছবি এখান থেকে নামিয়ে ফেল, নতুবা পরের বার আমি যখন আসব তখন যদি এগুলো এখানে থাকে তাহলে তোমার অবস্থা খুব খারাপ হবে। কিন্তু কায়েদ সাহেব সেসব ছবি সেখানেই ঝোলানো থাকতে দেন। কিছুদিন পর সে আবার কিছু কিনতে এসে দেখে, ছবিগুলো সেখানেই ঝোলানো রয়েছে। (এটি) দেখে সে চলে যায়। তিনি বলেন, কায়েদ সাহেব আমাদেরকে এ ঘটনা শোনানোর পর আরো ছবি দিতে বলেন। ভয় পাবার বদলে তিনি বলেন, এখন আমি আরো বিভিন্ন স্থানে এসব ছবি ঝোলাবো। এই পুরো অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে এসব জঙ্গীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে অথচ সেখানে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। এই অঞ্চলটির একদিকের সীমান্ত মালি সংলগ্ন আর আপরদিকে ডোরি অঞ্চলটি নাইজারের সীমান্ত সংলগ্ন; এভাবে এই পুরো অঞ্চলটিই বলতে গেলে তাদের কব্জায় রয়েছে।

যাহোক, এঁরা আহমদীয়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, নিজেদের পেছনে এক দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সন্তানসন্ততি এবং বংশধরকেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় সমৃদ্ধ করুন। শত্রু মনে করে, এঁদেরকে শহীদ করার মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্, এখানে আহমদীয়াত আগের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে ও বিস্তৃতি লাভ করবে।

সেখানকার ব্যবস্থাপনা এবং আমীর সাহেবেরও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত, সেখানে গিয়ে তাদেরকে সাহসও যোগানো উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা যে মহান উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তার গুরুত্ব বোঝার সামর্থও তাদের দান করুন। যাহোক, এখন সেখানে এক প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনার অধীনে আমাদের কাজ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আমি আগেও তাদের বলেছি, সেখানে যান এবং স্থানীয় মনুষদের সঙ্গে মিলে প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করুন।

শহীদদের পরিবারের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে, তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য চতুর্থ খলীফার যুগ থেকেই সৈয়্যদানা বেলাল ফান্ড নামে একটি ফান্ড প্রতিষ্ঠিত আছে, যা থেকে শহীদদের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই ঘটনার পর কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও এবং বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও জামা'তও তাদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ পাঠাচ্ছে যে, এ অর্থ তাদের জন্য। অথচ একটি ফান্ড যেহেতু ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে, তাই সবার উচিত তারা যে অর্থই দিতে চায় তা সৈয়্যদানা বেলাল ফান্ডে যেন জমা দেওয়ার পর জানিয়ে দেয়, আমরা এই অর্থ জমা দিয়েছি এবং আমাদের ইচ্ছা হলো তা যেন বিশেষভাবে ডোরির মেহদিয়াবাদের শহীদদের জন্য ব্যয় করা হয়। তাহলে কেন্দ্র অবশ্যই সে অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে।

কোনো অর্থ আসুক বা না আসুক, কেন্দ্র তো তাদের চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং (তা) পূরণ করবেই, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু যারা দিতে চান তারা এই ফান্ডে, অর্থাৎ সৈয়্যদানা বেলাল ফান্ডে অর্থ জমা দিন। এটি এসব শহীদের পরিবারের প্রতি কোনোরূপ অনুগ্রহ নয়, বরং তাদের প্রয়োজনের খেয়াল রাখা এবং তা পূরণ করা আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব।

সবশেষে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন,

"এটি মনে করো না যে, খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা মাটিতে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন, এই বীজ উদ্গত হবে, ফুল দেবে এবং চর্তুদিকে এর ডালপালা বিস্তৃতি লাভ করবে আর এক মহা মহিরুহে পরিণত হবে, (ইনশাআল্লাহ্)। সুতরাং সৌভাগ্যবান তারা যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিপদাপদে ভীত হয় না, কারণ বিপদাপদের আপতিত হওয়াও আবশ্যক যেন খোদা তোমাদের পরীক্ষা করেন। "

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৯)

অতএব এসব কুরবানী প্রদানকারী তো এই পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এখন তাদের জন্যও নিজ নিজ ঈমান ও একীনে উন্নতি করার পরীক্ষা যারা পিছনে রয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এবং আমাদেরকেও পূর্ণাঙ্গীন ঈমান ও একীনে অটল থাকার সামর্থ দিন।

এসব শহীদের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লা উত্তরোত্তর উন্নিত করুন। তাদের এসব আত্মত্যাগকে তিনি ফুলেফলে সুশোভিত করুন যার ফলে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে আমরা পৃথিবীর বুকে দ্রুততম সময়ে বিস্তার লাভ করতে দেখতে পাই। এছাড়া পৃথিবী থেকে অজ্ঞতা দূরীভূত হোক এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রকৃত রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক।

নামাযের পর এসব শহীদদের জানাযার সাথে এখন আমি আরো দুজন নিষ্ঠাবান আহমদীর জানাযাও পড়াব। তাদের একজন হলেন ডক্টর করীমুল্লাহ্ যিরভি সাহেব, তিনি সূফী খোদাবখ্শ যিরভি সাহেবের পুত্র ছিলেন এবং (বর্তমানে) আমেরিকা নিবাসী ছিলেন। গত ৪ঠা জানুয়ারি তিনি ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন।

তার পিতা সূফী খোদাবখ্শ সাহেব ১৭ বছর বয়সে ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। করীমুল্লাহ্

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-ভালবাসা

-বশীরুদ্দীন কাদের , মুরুব্বী সিলসিলা , বদর অফিস।

যে কোনও ব্যক্তির জীবনী বর্ণনা করা অবশ্যই একটা কঠিন কাজ। কেননা এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়। আর যখন কোনও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর ন্যায় মহামর্যাদাবান ও সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের জীবনী লেখার প্রসঙ্গ আসে, যিনি এ জগতের জন্য আশীর্বাদ, মানবজাতির গর্ব আর যাঁর কারণে আল্লাহ্ তা'লা এই সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তখন তার জীবনী বর্ণনা করা যে এক অসাধ্য সাধন তা বলাই বাহুল্য। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে ভালবাসা ও মাধুর্য দিয়ে নিজের লেখনীতে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী বর্ণনা করেছেন তার নজির অন্যত্র পাওয়া যায় না। কেননা একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের গুণাবলীকে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে যে, তার প্রতিটি শব্দে প্রেমাস্পদের প্রতি ভালবাসা ঝরে পড়ে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর থেকে বড় প্রেমিক আর কেউ নেই যে আঁ হযরত (সা.)কে এত ভালবাসে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর কবিতা রচনায় লিখেছেন-

'বাআদ আয খোদা বা ইশকে মহম্মদ মুখার্‌রম, গার কুফর ঈঁ বাওয়াদ বাখুদা সখত কাফেরাম'

অর্থাৎ, খোদার পর মহম্মদের প্রেমে আমি বিভোর হয়ে আছি, এটা যদি কুফর হয়ে, তবে খোদার কসম! আমি সব থেকে বড় কাফের।'

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন ৩য় খণ্ড ,পৃ: ১৮৫)

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি থেকে অনুমান করা যায়। তিনি (আ.) বলেন-

'যারা খোদার বিষয়ে ভয়ডরহীন হয়ে অন্যায়ভাবে আমাদের সম্মানীয় নবী হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) কে অসম্মান সূচক নামে সম্বোধন করে এবং তাঁর প্রতি অপবিত্র অপবাদ আরোপ করে এবং কটূক্তি করা থেকে বিরত হয় না, তাদের সঙ্গে আমি কিভাবে আপোষ করতে পারি? আমি সত্য সত্য বলছি, মরুভূমির সাপ ও বন্য নেকড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি, কিন্তু তাদের সঙ্গে মীমাংসা করতে পারি না যারা আমাদের পিতামাতা ও নিজেদের প্রাণের থেকেও প্রিয় নবী (সা.) এর উপর এমন অপবিত্র আক্রমণ করে। খোদা আমাদেরকে ইসলামের উপর মৃত্যু দিন, আমরা এমন কাজ করতে চাই না যার কারণে ঈমান ধ্বংস হয়।'

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ:৪৫৯)

নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমান আঁ হযরত (সা.)কে ভালবাসে আর তাঁর পবিত্র জীবনী বর্ণনা করে নিজেদের ভালবাসা ব্যক্ত করাকে নিজের সৌভাগ্য ও পুণ্য জ্ঞান করে। এই যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) সব থেকে বেশি আঁ হযরত (সা.)কে ভালবেসেছেন, এতটাই যে, তার নজির পাওয়া যায় না। তিনি সব সময় বলতেন, আমি যা কিছু পেয়েছি তা সবই নবী করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের কল্যাণে। আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসা এতটাই অকৃত্রিম ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে তিনি ''هٰذَا رَجُلٌ يُّحِبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ'' সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানীয় খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮, উপটিকা নং-৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

'সেটি কোন বস্তু যা আঁ হযরত (স.)-এর পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার পর সর্ব প্রথম হৃদয়ে জন্ম লাভ করে? স্মরণ রাখতে হবে যে, সেটি হল সুস্থ হৃদয়। অর্থাৎ ঐ হৃদয় হতে পৃথিবীর ভালবাসা তিরোহিত হয়ে যায় এবং তা এক অনন্ত ও স্থায়ী স্বাদের অন্বেষণকারী হয়ে ওঠে। এর পর এই সুস্থ হৃদয়ের দরুন একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসা অর্জিত হয়। এই সকল পুরস্কার আঁ হযরত (সা.)-এর আজ্ঞানুবর্তিতার দরুন উত্তরাধিকার রূপে পাওয়া যায় যেমন আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ:

অর্থাৎ তাদের বলে দাও, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে এস, আমার অনুবর্তিতা কর যাতে খোদাও তোমাদেরকে ভালবাসেন। এবং একতরফ ভালবাসার দাবী সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা কথা ও গালগল্প। যখন মানুষ সত্যিকারভাবে ভালবাসে তখন খোদাও তাকে ভালবাসেন। তখন পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তার জন্য খাঁটি ভালবাসা সৃষ্টি করা হয়। তাকে আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয়। তাকে একটি জ্যোতিঃ দান করা হয় যা সদা সর্বদা তার সঙ্গে থাকে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৪)

আঁ হযরত (সা.)-এর অত্যুন্নত চরিত্রের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: 'হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর যে অতি উন্নত চরিত্রের কথা কোরআন শরীফে বলা হয়েছে,তা মূসার চাইতে হাজারো গুণ বেশি। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা বলেই দিয়েছেন যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর চরিত্র ছিল সেই সমস্ত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর সমবেত ও সমন্বিতরূপ, যা অপরাপর নবীদের চরিত্রে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যেত। এছাড়া, আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ:

(নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত) ৬৮ঃ৫)

অর্থাৎ অত্যুন্নত চরিত্রের উপর তোমার অবস্থান। 'আজীম' (অতীব মহান ও উন্নত) শব্দের দ্বারা যে জিনিষের প্রশংসা করা হয়, আরবী বাগধারায় তার চরম প্রশংসাকেই বোঝায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বলা হয় যে, এই বৃক্ষটি একটি আজীম বৃক্ষ, তাহলে এর অর্থ হবে, একটা বৃক্ষ উচ্চতা, শাখা-প্রশাখা বিস্তারে এবং কাণ্ডে কতটা বিশাল হওয়া সম্ভব তা হয়েছে। তেমনিভাবে, এই আয়াতেরও তাৎপর্য এটাই যে, যতদূর পর্যন্ত একজন মানুষের পক্ষে উন্নত নৈতিক গুণাবলী, চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করা সম্ভব, তা সবই ছিল উৎকৃষ্টতম ও পূর্ণতমরূপে মুহাম্মদীয় সত্তার মধ্যে। সুতরাং এই প্রশংসা এত উন্নত স্তরের যে, তার চেয়ে বেশি প্রশংসা করা সম্ভবই নয়।

(বারাহীনে আহমদীয়া ,চতুর্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০৬, উপটিকা নং-৩)

'জান ও দিলাম ফিদায়ে জামালে মহম্মদ আস্ত/ খাকাম নিসারে কোচায়ে আলে মহম্মদ আস্ত।

অর্থ: আমার মন ও প্রাণ মহম্মদ (সা.)-এর সৌন্দর্যে নিবেদিত। আর আমার সত্তা নবী করীম (সা.)-এর বংশধরদের অলিতে গলিতে উৎসর্গিত।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনীর উপর দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর সারাটি জীবন কেটেছে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যে। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তিনি মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় জামাতে আহমদীয়া গ্রহণ করেন নি। পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর যুগে তিনি বয়আত করেন। তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে একবার তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

'আমার পিতা (হযরত মসীহ মওউদ)-এর মধ্যে একটি বিষয় আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করেছি।সেটি এই যে, আমার পিতা আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র কথা সহ্য করতে পারতেন না। কেউ যদি আঁ হযরত (সা.) বিরুদ্ধে সামান্য কোনও অবমাননাকর কথাও বলে ফেলত, তবে আমার পিতার চেহারা রক্তিম লাল হয়ে উঠত আর ক্রোধে চোখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে যেত। তিনি এমন বৈঠক থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে চলে আসতেন। আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি আমার পিতার ভালবাসা ছিল উন্মাদনার পর্যায়ের। এমন ভালবাসা যা কেউ কোনও দিন দেখে নি।" মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বার বার একথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন।

(সীরাতে তৈয়্যবা, মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ২৮-২৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সুপুত্র কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ লেখেন-

"একবার বাড়ির অন্দর মহলের খবর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শরীর কিছুটা খারাপ ছিল। তিনি ঘরের চারপাই-এর উপর শায়িত ছিলেন। হযরত আম্মাজান এবং আমাদের নানাজান অর্থাৎ মীর নাসের নওয়াব সাহেব মরুহুমও (রা.) পাশে বসে ছিলেন। কথায় কথায় হজ্জের প্রসঙ্গ উঠল। হযরত নানাজান সম্ভবত বললেন, এখন তো হজ্জের জন্য যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা তৈরী হচ্ছে। তাই হজ্জে যাওয়া উচিত। সেই সময় দুই পবিত্র নগরী যিয়ারতের কল্পনামাত্রই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চোখদুটি ছলছল করে ওঠে। তিনি (আ.) নিজের হাতে আঙুল দিয়ে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: আমি আদম সন্তানের নেতা। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum and Family, Bhagbangola, (MSD)

চোখের পানি মুছছিলেন আর হযরত নানাজানকে বলছিলেন–

'একথা তো ঠিক, আর আমার আন্তরিক বাসনাও আছে। কিন্তু আবার চিন্তা করি, আঁ হযরত (সা.)–এ মাজারকে আমি দেখতেও কি পারব?"

এটি নিছক একটা পারিবারিক ঘটনা, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে এর মধ্যে অথৈ সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউ তরঙ্গায়িত হচ্ছে, একটা প্রেমের অথৈ সমুদ্র যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বুকে রসুল প্রেমের উদ্বেল ঢেউ তুলেছিল। কোন্ সত্যিকার মুসলমান হজ্জের বাসনা করে না? কিন্তু সেই ব্যক্তির সীমাহীন ভালবাসা সম্পর্কে অনুমান করে দেখুন যার আত্মা হজ্জের কল্পনা মাত্রই পতঙ্গের ন্যায় রসুল পাক (সা.)–এর মাজারে পৌঁছে যায় আর সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

(সীরাতে তৈয়্যবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, পৃ: ৩০–৩১)

হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, একটি বিষয় যা আমি বিশেষভাবে দেখেছি, সেটি এই যে, হযরত সাহেব (অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর বিরুদ্ধে আমার পিতা কোনও কথাই সহ্য করতে পারতেন না। কেউ যদি আঁ হযরত (সা.) বিরুদ্ধে সামান্য কোনও অবমাননাকর কথাও বলে ফেলত, তবে আমার পিতার চেহারা রক্তিম লাল হয়ে উঠত আর ক্রোধে চোখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে যেত। তিনি এমন বৈঠক থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে চলে আসতেন। আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি আমার পিতার ভালবাসা ছিল উন্মাদনার পর্যায়ের। এমন ভালবাসা যা কেউ কোনও দিন দেখে নি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলতেন ১৯০৭ সালে আর্য সমাজীরা যখন লাহোরে জলসা করল, তারা অপরাপর ধর্মের অনুসারীদেরও আহ্বান করল, তখন হযরত মির্যা সাহেব তাদের অনুরোধে একটি নিবন্ধ রচনা করে হযরত মৌলবী সাহেব খলীফাতুল মসীহ আওয়াল –এর নেতৃত্বে জামাতের একদল সদস্যকে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য লাহোর প্রেরণ করেন। কিন্তু আর্যরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নিজেদের প্রবন্ধে আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য ব্যক্ত করে। মির্যা সাহেব যখন এই সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি জামাতের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এই বলে যে, আমাদের জামাতের সদস্যরা সেই মজলিস থেকে কেন উঠে চলে আসে নি? আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে কোনও মজলিসে কটুক্তি করা করতে শুনেও একজন মুসলমান হয়ে সেই মজলিসে বসে থাকা চরম পর্যায়ের নির্লজ্জতা। ক্রোধে তাঁর চেহারা লাল হয়ে ওঠে আর ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, আমাদের লোকগুলি কেন ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করল না? যখন তারা কটুক্তি শুরু করেছিল, তখনই সেখান থেকে উঠে চলে আসা উচিত ছিল।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০১, রেওয়ায়েত নম্বর–১১৬)

আঁ হযরত (সা.)–এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন–

'আমি কেবল খোদার ফযলে, না আমার কোন গুণের দরুন, এই পুরস্কারের পূর্ণ অংশ লাভ করেছি, যা আমার পূর্বে নবী–রসুল ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হয়েছিল। আমি যদি স্বীয় সৈয়্যদ ও মওলা, নবীগণের গৌরব, সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর পথের অনুসরণ না করতাম তবে এই পুরস্কার লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২২, পৃ: ৬৪)

অন্যত্র তিনি বলেন,

"প্রকৃতপক্ষে এই সব অনুগ্রহের সত্যায়নস্থল হলেন আঁ হযরত (সা.)। আর একথা সকল ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনও মোমেনের ইলহামের প্রতিটি প্রশংসা বস্তুতপক্ষে আঁ হযরত (সা.)–এর প্রশংসা। আর সেই মোমেন নিজের আনুগত্য অনুপাতে সেই প্রশংসা থেকে অংশ লাভ করে। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮০–৫৮১, উপটিকা নম্বর–৩)

কিন্তু প্রকৃত আনুগত্যের মধ্যে ভালবাসার অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি কোনও শ্রমিকের কাজের প্রতি ভালবাসা না থাকে, আবেগ না থাকে তবে তার কাজও তেমন উৎকৃষ্ট মানের হবে না। তবে কোনও ব্যক্তি যদি নিজের কাজকে ভালবাসে তবে বোঝা যায় যে, কাজের প্রতি তার ভালবাসা তার কাজকে উৎকৃষ্ট করে তোলে। সাধারণ নিয়মে যদি কোনও ব্যক্তি নিজের কাজকে ভালবাসে বা কোনও পেশাকে ভালবাসে তবে দেখা গেছে যে, তার উপরই সেই কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) –এর আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি পরম পর্যায়ের ভালবাসা ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেই হুযুর (সা.)–এর ধর্মের সংস্কারের জন্য বেছে নেন।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন– রসুলকে ভালবাসার পরিণামে আমি তোমাদেরকে ভালবাসব। এখন ভেবে দেখার বিষয় এই যে, ঐশী প্রেমের বৈশিষ্ট্যবলী কি কি? যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে, নিশ্চয় সে আঁ হযরত (সা.)–এর যুগে হওয়ার বাসনা করবে। সে আকাঙ্খা করবে যে, সে যদি সেই যুগে হত যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়ভাজনের উপর ওহী নাযেল করেছিলেন আর পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। কতই না সৌভাগ্যবান সেই সাহাবী যাঁরা সেই সময়কে পেয়েছেন, হুযুর (সা.)কে মান্য করেছেন, তাঁর কাছে ধর্ম শিখেছেন এবং সেই কামেল রসুল ও তাঁর খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন!

প্রত্যেক সুস্থ বিবেকবান মানুষ একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করেছেন। এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর এই স্বপ্নের বর্ণনা থেকে পাই যা তিনি ১৮৮৬ সালে বর্ণনা করেছিলেন।

" স্বপ্নে দেখলাম, লোকেরা একজন নবজীবন দানকারীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এক ব্যক্তি এই অধমের নিকট এসে ইঙ্গিতে বলল, 'হাজা রাজুলুন ইহুব্বু রসুলুল্লাহ্, অর্থাৎ এ সেই ব্যক্তি যে রসুলুল্লাহ্ কে ভালবাসে। এই কথার অর্থ ছিল যে, এই পদের জন্য প্রধান শর্ত হল রুসলের প্রতি ভালবাসা যা এই ব্যক্তির মধ্যে প্রমাণিত।" "

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ : ৩৪)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.) লেখেন–

সে আর্যদের পদ্ধতিতে করজোড়ে হযরত আকদস (আ.)কে সালাম করল, কিন্তু হযরত সাহেব শুধু মাথা তাঁকে এক মুহূর্ত দেখেই ওজু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সে মনে করল, হযরত সাহেব হয়তো (সালাম) শুনতে পান নি। সে পুনরায় সালাম করল। হযরত রীতিমত ব্যস্ত থাকলেন। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। কেউ বলল, লেখরাম আপনাকে সালাম করছিল। হযরত সাহেব বললেন, 'সে আঁ হযরত (সা.)–এর অবমাননা করেছে। তার সালামের উত্তর দেওয়া আমার ঈমানের পরিপন্থী। আঁ হযরত (সা.)–এর পবিত্র সত্তার উপর আক্রমণ করে আর আমাকে সালাম করতে এসেছে?

(হায়াতে তৈয়্যবা, পৃ: ২১১)

এটি তাঁর সেই আত্মাভিমানের নমুনা যা তাঁর মধ্যে আঁ হযরত (সা.)–এর ভালবাসার কারণে জেগে উঠেছে। তাঁকে নিজেকে কেউ গালমন্দ করার কারণে সেই আত্মাভিমান জাগে নি। বরং তা জেগেছে তাঁর প্রেমাস্পদের প্রতি অবমাননা করার কারণে। তিনি তাঁর অসংখ্য বই–পুস্তক, ইশতেহার ও নযমে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আঁ হযরত (সা.)–এর অসম্মান করার সম্ভব নয়, তাঁর পবিত্র জীবন সম্পর্কে কোনও সুস্থ বিবেকবান মানুষ নিন্দা করতে পারবে না। তিনি (সা.) ইসলামের সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের হাত থেকে সমস্ত রকমের হাতিয়ার কেড়ে নিয়েছেন।

তাঁর বিস্ময়কর ভালবাসা উর্ধ্বলোকেও গ্রহণীয়তার মর্যাদা পেয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এবং জগতবাসীকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সেই ভালবাসাকে গ্রহণ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম মহম্মদ (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম) তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিতাপ! তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই 'তওহীদ' যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এইজন্য খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী এবং সমস্ত ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আওয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর অভিপ্সীত সকল প্রত্যাশাই পূর্ণ করে দিয়েছেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২২, পৃ: ১১৮–১১৯)

তিনি আরও বলেন;

''হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানবাত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, এবং সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কুরআন, এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু

যুগ খলীফার বাণী

মোমেনদের জন্য নিজেদের আনুগত্যের মান ক্রমশ উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। (খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

"আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সোপান হল নামায।"

(ফিনল্যাণ্ডে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে, ২০১৯ সাল)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও পবিত্র গৌরবের এই প্রমাণ আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রুহুল কুদ্দুসকে (পবিত্র আত্মা বা জিব্রাইলকে) পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।'

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ:১৪১)

তিনি বলেন: "কিন্তু যারা খোদাকে ভয় না করে অন্যায়ভাবে আমাদের সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে মন্দ ভাষায় উল্লেখ করে, তাঁর প্রতি অপবিত্র অপবাদ আরোপ করে এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা থেকে বিরত হয় না, তাদের সাথে আমরা কীভাবে সন্ধি করতে পারি? আমি সত্য সত্য বলছি, আমরা মরুভূমির সাপ ও জঙ্গালের বাঘের সাথে সন্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি না যারা আমাদের সেই প্রিয় নবীকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, যিনি আমাদের প্রাণ ও পিতামাতার চেয়েও বেশি প্রিয়। খোদা আমাদেরকে ইসলামের মৃত্যু দিন। আমরা এরূপ কাজ করতে চাই না, যাতে ঈমান চলে যায়।"

(পয়গামে সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৫৯)

একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর গৃহ সংলগ্ন আল বায়ত, যেটি আল বায়তুল মুবারক নামে পরিচিত, সেখানে একাকী পায়চারি করছিলেন। আর মৃদু স্বরে কিছু গুনগুন করছিলেন, সেই সাথে তাঁর চোখদুটি থেকে অশ্রু ধারা বয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু বাইরে থেকে শুনল, তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবী হযরত হুসসান বিন সাবিত (রা.)-এর একটি পঙক্তি পাঠ করছিলেন যা হযরত হুসসান (রা.) আঁ হযরত (স.)-এর মৃত্যুর পর পাঠ করেছিলেন। সেই পঙক্তিটি হল-

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِيَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

অর্থাৎ, "হে খোদার প্রিয় রসুল! তুমি আমার নয়নের মণি ছিলে যা তোমার মৃত্যুতে অন্ধ হয়ে গেছে। এখন তোমার মৃত্যুর পর যে খুশি মরুক (তাতে আমার পরোয়া নেই) আমি তো কেবল তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা করতাম যা আজ সংঘটিত হল।"

(দিওয়ানে হুসসান বিন সাবিত)

বর্ণনাকারী বলেন, আমি যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল বায়তে এভাবে নির্জনে ক্রন্দনরত দেখে ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম হযরত! বিষয়টি কি, হুযুর কোন মর্মযাতনা পেয়েছেন? তিনি (আ.) বললেন, এখন আমি হযরত হুসসান বিন সাবিত (রা.)-এর এই পঙক্তিটি পাঠ করছিলাম আর আমার মনে এই বাসনার উদ্রেক হচ্ছিল যে, 'এই পঙক্তিটি যদি আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হত!"

(সীরাতে তৈয়্যবা, পৃ: ২৭-২৮, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, প্রকাশকাল: ১৯৬০)

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন:

'এক রাত্রিতে এই অধম এত অত্যধিকহারে দরুদ পাঠ করল যে, মন ও প্রাণ সুরভিত হয়ে উঠল। সেই রাতেই স্বপ্নে দেখলাম, ফিরিশতারা স্বচ্ছ পানি রূপে জ্যোতির মশক এই অধমের গৃহে নিয়ে আসছে আর তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, এগুলি সেই সকল আশিসরাজি যা তুমি মহম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮)

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসা এমনই ছিল যা অনুমান করা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভালবাসার এই উপাখ্যান কোনও ক্ষণস্থায়ী ও আকস্মিক আবেগের পরিণাম ছিল না, বরং সেই ভালবাসা তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও শিরা-উপশিরায় বহমান ছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে চলার তৌফিক দিন। আমীন ।

****

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব বলেন-

"যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ব্যক্তি চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, এর সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে খোদা ও তাঁর রসুলের ভালবাসা। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা, লেখনী, কথাবার্তা, ওঠাবসা এই ভালবাসার আবেগে পরিপূর্ণ ছিল। এই ভালবাসা এমন পরম পর্যায়ে উপনীত ছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। শত্রুর প্রত্যেক কঠোরতাকে তিনি এমনভাবে সহ্য করে নিতেন যেন কিছুই হয় নি। আর পক্ষ থেকে কোনও প্রকার যাতনা ও কটুক্তি তাঁকে উত্তেজিত করতে পারত না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-সত্তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র কথাও তাঁর রক্তে এমন উত্তেজনার সঞ্চার করত যে, তৎক্ষণাত তাঁর মুখমণ্ডল এমনভাবে ঝলসে উঠত যে তার উপর দৃষ্টি টিকতে পারত না। আপনপর তথা শত্রুমিত্র সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করবে যে, আঁ হযরত (সা.)কে তিনি যেভাবে ভালবাসতেন তার দৃষ্টান্ত কোনও যুগে কোনও মুসলমানের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। এমন মনে হত যেন, এই ভালবাসাই হল তাঁর জীবনের স্তম্ভ আর এটিই তাঁর আত্মার খোরাক। যেভাবে কোনও উৎকৃষ্ট স্পঞ্জের টুকরো পানিতে ডুবিয়ে তুলে নিলে এর প্রতিটি ছিদ্র পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, এর কোনও অংশে পানি ছাড়া অন্য কিছু থাকে না, অনুরূপভাবে প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শী দেখতে পেত যে, তাঁর শরীর ও আত্মার প্রতিটি কণা ঐশী প্রেম ও রসুল প্রেমে এমনভাবে পরিপূর্ণ যে, এর মধ্যে অন্য কিছু ঠাঁই পায় না।"

(সীরাতুল মাহদী, রেওয়ায়েত নম্বর, ৩২৪)

'এক রাত্রিতে এই অধম এত অত্যধিকহারে দরুদ পাঠ করল যে, মন ও প্রাণ সুরভিত হয়ে উঠল। সেই রাতেই স্বপ্নে দেখলাম, ফিরিশতারা স্বচ্ছ পানি রূপে জ্যোতির মশক এই অধমের গৃহে নিয়ে আসছে আর তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, এগুলি সেই সকল আশিসরাজি যা তুমি মহম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে। আরও একটি বিচিত্র ঘটনা স্মরণে এল। একবার ইলহাম হল যার অর্থ ছিল,'ফিরিশতাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য ঐশী বাসনা উদ্বেলিত হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফিরিশতাদের নিকট সেই নবজীবন দানকারীর বিষয়ে স্পষ্ট হয় নি। সেই কারণে তাদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। এরই মাঝে আমি স্বপ্নে দেখলাম, লোকেরা একজন নবজীবনদানকারীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। আর এক ব্যক্তি এই অধমের সামনে এসে ইঙ্গিতে বলল, 'হাজা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসুলাল্লাহ্। অর্থাৎ এটি সেই ব্যক্তি যে রসুলুল্লাহকে ভালবাসে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ৫৯৮)

তিনি আরও বলেন-

'সকল নবীগণের উপর নবী করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আমার ঈমানের সর্ববৃহত অংশ যা আমার শিরায় উপশিরায় মিশে আছে। এটিকে বের করে ফেলা আমার হাতে নেই। হতভাগা ও চক্ষুহীন বিরুদ্ধবাদীরা যা খুশি বলুক, আমাদের নবী করীম (সা.) সেই কাজ করেছেন যা তা ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে কারো পক্ষেই করা সম্ভব ছিল না। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ মাত্র।'

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২০)

খুতবার শেষাংশ....

যিরভি সাহেব হযরত মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের জামাতাও ছিলেন। অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ ছিলেন, কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। জামা'তের অনেক সেবা করারও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো যিরভি সাহেবের সহধর্মিণী আমাতুল লতিফ যিরভি সাহেবার। তিনি করীমুল্লাহ্ যিরভি সাহেবে স্ত্রী ছিলেন, আমেরিকায় বসবাস করতেন আর তিনি মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের মেয়ে ছিলেন। তিনি ৬ জানুয়ারি নিজ স্বামীর মৃত্যুর দুদিন পরই ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

মরহুমা ওসীয়্যতকারী ছিলেন। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, তিনি মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের মেয়ে ছিলেন। তার মাতার নাম ছিল রশীদ শওকত যিনি রাবওয়া থেকে প্রকাশিত মিসবাহ্ পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। তার জন্ম হয়েছিল কাদিয়ানে। খুবই জ্ঞান-পিপাসু একজন মহিলা ছিলেন। শিক্ষিতা ছিলেন, এমএসসি পাশ করেছিলেন। জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথেও ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার ভাই মালেক মুজিবুর রহমান সাহেব তার বোন এবং ভগ্নিপতি সম্পর্কে লিখেন, এই দম্পতির মাঝে গভীর ভালোবাসা ছিল। তারা অনেক কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও কখনো কোনো বিষয়েঅভিযোগ করেন নি। কখনোই আমি তাদেরকে অন্য কারো সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করতে শুনি নি। তারা উভয়ই জ্ঞানের এক গভীর সমুদ্র ছিলেন । জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে তাদের ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল; তাদের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি তারা দৃষ্টি রাখতেন আর ভীষণ আদর ও স্নেহ করতেন। মাশাআল্লাহ্ তারা খুবই পূর্ণাঙ্গীন ও সুন্দর জীবনযাপন করেছেন। নিজেদের সমাজ এবং পরিবেশের অন্যদের ওপর তারা অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব রাখতেন এবং তারা প্রতিপত্তিশালী ও পুণ্যবান

যুগ ইমামের বাণী

আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো, তা হলেও আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না।

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, kolkata

জুমআর খুতবা

হে আল্লাহ্! মহম্মদ (সা.) যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছেন তা যদি সত্যি হয় তবে সাত বারই তাঁরই তির বের কর। আমি ৭ বার শুভাশুভ নির্ণয় করি আর ৭ বারই তাঁর তির বের হয়।

আঁ হযরত (সা.)এর মর্যাদাবান ও নিষ্ঠাবান সাহাবা হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের, হযরত আবুষ যায়াহ বিন সাবিত বিন নুমান, হযরত আনাসা মৌলা রসুলুল্লাহ্, হযরত আবু মারসাদ বিন আবি মারসাদ, হযরত আবু মারসাদ কান্নায, হযরত সালীত বিন কায়েস বিন আমর, হযরত মুজাযযির বিন যিয়াদ, হযরত রিফাআ বিন রাফি বিন মালিক বিন আজলান, হযরত আবু উসায়েদ বিন মালিক রাবিয়া, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ, হযরত খাল্লাদ বিন রাফে, হযরত আব্বাদ বিন বিশর, হযরত হাতিব বিন আবি বালতা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৭ শে জানুয়ারী, **২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৭ শে সুলাহ, ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়াহ্ এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ সাহাবীদের স্মৃতিচারণ থেকেই কিছু বর্ণনা করব। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের (রা.)-এর। তার সম্পর্কে আরো কিছু রেওয়ায়েত পাওয়া গেছে সেগুলো উপস্থাপন করছি। (তার) বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্ তার পু স্তক আল ইস্তি য়াবে লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.)পবিত্র কুরআনের আয়াত, وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا (সূরা আত তাওবা: ১০২) অর্থাৎ এবং আরো কতক এমন আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছেন আর তারা সৎকর্ম ও অপরাপর মন্দকর্মের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) আরো বলেন, এই আয়াত আবু লুবাবা এবং তার সাথের সাত, আট বা নয়জন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লোক তবুকের যুদ্ধের সময় পেছনে রয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নিকট তওবা করেন এবং নিজেরাই নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। তাদের সৎকর্ম ছিল তওবা করা আর মন্দকর্ম ছিল জিহাদ বা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকা।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৪১)

মুজাম্মে বিন জারীয়ার পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত খানসা বিনতে খিদাম (রা.) হযরত উনায়েস বিন কাতাদা (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি (রা.) ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হলে হযরত খানসা বিনতে খিদাম (রা.)-এর পিতা মুযায়না গোত্রের এক লোকের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেন যাকে তিনি পছন্দ করতেন না। হযরত খানসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তার বিয়ে বাতিল আখ্যা দেন। তারপর হযরত খানসা (রা.)কে হযরত লুবাবা (রা.) বিয়ে করেন। তাদের ঘরে হযরত সায়েব বিন আবু লুবাবা(রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

(মারিফাতুস সাহাবা লি আবি নাঈম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫০)

আব্দুল জব্বার বিন ওয়ার্ দ হতে বর্ণিত, আমি ইবনে আবি মুলাইকার কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আ বি ইয়াযিদের বক্তব্য হলো, হযরত আবু লুবাবা (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন আর আমরা তার সাথে ছিলাম। এভাবে তিনি তার বাড়িতে যান আর আমরাও তার সাথে বাড়িতে প্রবেশ করি। আমরা দেখি এক ব্যক্তি জীর্ণ ও পুরোনো কাপড় পরে বসে আছেন, আমি তার কাছে শুনেছি তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস-১৪৭১)

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো, হযরত আবু আয্ যিয়াহ্ বিন সাবেত বিন নু 'মান (রা.)-এর। একটি রেওয়ায়েতে অনুসারে হযরত আবু যিয়াহ্ মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন কিন্তু গোছায় পাথরের আঁচড় লাগায় আহত হন, যে কারণে তিনি ফেরত চলে যান। মহানবী (সা.) বদরের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদে) তার জন্য অংশ রাখেন। (আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫২)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো মহানবী (সা.)-এর মু ক্ত ক্রীতদাস আনসা (রা.)-এর। হযরত আনসা (রা.)-এর ডাকনাম আবু মাসরূহ আবার কারো কারো মতে, আবু মিসরাহ্ বর্ণিত হয়েছে।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড,পৃ; ২৮৩) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০১)

হযরত আনসা (রা.) সারায় জন্মগ্রহণ করেছেন। সারাহ্ হচ্ছে ইয়েমেন ও ইথিওপিয়ার নিকটবর্তী একটি স্থান। তার হিজরত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদম (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। অথচ কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি হযরত সা'দ বিন খায়সামা (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

ইমাম যুহরি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যোহরের পরে সাক্ষাত প্রার্থীদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে দিতেন। আর হযরত আনসা (রা.) তাঁর (সা.) কাছ থেকে এসব লোকের জন্য অনুমতি নিতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

তার দায়িত্ব ছিল বাড়ির ভেতরে সাক্ষাতপ্রার্থীদের সম্পর্কে অবহিত করা।

এরপর রয়েছে হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। ইমরান বিন মানাহ্ বলেন, যখন আবু মারসাদ ও তাঁর পুত্র মারসাদ বিন আবি মারসাদ মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন তখন তারা উভয়ে হযরত কুলসুম বিন হিদম (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, তিনি ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন আর রাজীর যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

হযরত মারসাদ (রা.)-এর উনায়েস বিন আবিমারসাদ আল গানভী নামক এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাকে আনাস নামেও ডাকা হতো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আনীস পাওয়া যায়। তিনি মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধেও মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন।(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬)

ইবনে হাজরের বর্ণ না করেন, হযরত মারসাদ (রা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে শাহাদত বরণ করেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৪২)

এরপর রয়েছে হযরত আবু মারসাদ কান্ন যি বিন আল হুসাঈন আল গানভী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। তার নাম ছিল কান্ন য। তার পিতার নাম (ছিল) হুসাঈন বিন ইয়ারবু । তার নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তার নাম ছিল কান্ন য বিন হুসাঈন আবার কারো কারো মতে হুসাঈন বিন কান্ন য ছিল। এছাড়া আরো বলা হয়েছে, তার নাম ছিল আয়মান। কিন্তু কান্নায বিন হুসাঈন নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, লি ইবনে হাজার আসকালানি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩০৫)

হযরত আবু মারসাদ হযরত হামযা (রা.)-এর সমবয়সী এবং তাঁর মিত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহের অধিকারী ছিলেন এবং তার মাথার চুল ছিল ঘন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

হযরত আবু মারসাদ এবং তার ছেলে হযরত মারসাদ (রা.) উভয়েই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পুত্র হযরত মারসাদ (রা.) রাজীর ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহবা লি ইবনে আসীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৭৬)

(যা) পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবু মারসাদ (রা.)-এর এক পৌত্র হযরত উনায়েস বিন মারসাদ (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহবা লি ইবনে আসীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬)

বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) তাঁর চাচা হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর নেতৃত্বে ৩০জন উষ্ট্রারোহী মুহাজিরীনের একটি দলকে মদীনার পূর্বদিকে সাইফুল বাহরের অঞ্চলের ঈস অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত হামযা (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে দেখেন, মক্কার সবচেয়ে বড় নেতা আবু জাহল তিনশ অশ্বারোহীর একটি সৈন্যদল নিয়ে তাদের জন্যঅপেক্ষা করছে। উভয় সেনাদলই পরস্পরের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হতে আরম্ভ করে এবং যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল বলে, ইতঃমধ্যে সেই অঞ্চলের নেতা মাজদী বিন আমর আল্ জুহনী যিনি উভয় গোত্রের সাথেই সুসম্পর্ক রাখতেন তিনি উভয় গোত্রের মাঝে মধ্যস্থতা করেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হতে হতে থেমে যায়। এই অভিযানটি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের যুদ্ধ নামে সুপরিচিত। হযরত আবু মারসাদ (রা.)ও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.) হযরত হামযার (রা.)-এর জন্য সর্বপ্রথম পতাকা বেঁধেছিলেন এবং এই যুদ্ধে হযরত আবু মারসাদ (রা.) হযরত হামযা (রা.)-এর এই পতাকাটি বহন করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩-৪)

এরপর রয়েছে হযরত সালিত বিন কায়েস বিন আমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। হযরত সালিত আনসারের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু আদি বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩৮)

হযরত সালিতের মায়ের নাম ছিল হযরত যুগায়বা বিনতে যুরারা যিনি হযরত আসাদ বিন যুরারা (রা.)-এর বোন ছিলেন।একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের ভাই ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদকে বদরের যুদ্ধের সময়ে হযরত সালিত বিন কায়েস বন্দি করেছিলেন।

(ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪৮)

মক্কা বিজয়ের সময় আনসারের গোত্র বনু মা'যেনের পতাকা হযরত সালিত বিন কায়েসের নিকট ছিল।

(ইমতাউল আসমা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৬৮-১৬৯)

অনুরূপভাবে হুনাইনের যুদ্ধের সময়ও বনু মা'যেনের পতাকা হযরত সালিতের নিকট ছিল। (কিতাবুল মাগাযি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৯৬)

ত্রয়োদশ হিজরীতে এবং কারো কারো মতে চতুর্দশ হিজরীর প্রারম্ভে হযরত উমর(রা.)-এর খিলাফতকালে জিসরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমান ও পার সিকদের মাঝে বর্তমান ইরাকঅঞ্চলে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হযরত আবু উবায়েদ বিন মাসউদ সাকাফি (রা.)। তাই এই যুদ্ধকে 'জঙ্গে জিসর আবি উবায়েদ'ও বলা হয়। এই যুদ্ধের আরো নাম রয়েছে, মারওহার যুদ্ধ যা ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। কু স্সুন নাতেফের যুদ্ধ, এটিও ফুরাত নদীর পূর্ব তীরে কুফার নিকটবতী একটি জায়গার নাম। এই যু দ্ধে ২,০০০ ইরানি নিহত হয়, অথচ কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী ৬,০০০ ইরানি নিহত হয়েছিল। কতিপয় মুসলিম রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাদলের ১,৮০০ মুসলমান শহীদ হয়েছেন, যদিও কারো কারো মতে ৪,০০০ মুসলমান শহীদ হয়েছেন, যাদের মাঝে ৭০ জন আনসার এবং ২২ জন মুহাজেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এসব শহীদের মাঝে হযরত সালিত বিন কায়েস (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারো কারো মতে এ যুদ্ধে হযরত সালিত বিন কায়েস সবার শেষে শহীদ হয়েছেন।

(মুজামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪৯) (এটলাস ফুতুহাতে ইসলামিয়া, প্রণেতা- আহমদ আদিল কামাল, ২য় খণ্ড,পৃ: ৯০)

কতিপয় ঐহিতাসিকের মতে তার (রা.) কোনো বংশধর অবশিষ্ট ছিল না। যদিও কারো কারো মতে তাঁর ছেলের নাম আব্দুল্লাহ্ বিন সালিত ছিল, যিনি তাঁর কাছে থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সালিত (রা.)-এর একজন কন্যা ছিল যার নাম সুবায়তা ছিল, যিনি হযরত সুখায়লা বিনতে সিম্মার গর্ভজাত ছিলেন।

যুগ ইমামের বাণী

অভিশপ্ত ঐ জীবন, যা কেবল দুনিয়ার জন্য এবং হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতঈন)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

উসদুল গাবার প্রণেতা লিখেন, তার সন্তাদের বংশধারা এগোয় নি।

আব্দুল্লাহ্ বিন সালিত বিন কায়েস তার পিতা হযরত সালিত বিন কায়েস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তির বাগান ছিল যেখানে অন্য কোনো আনসার সাহাবীর খেজুরের গাছ ছিল আর সেই ব্যক্তি এই বাগানে সকাল-সন্ধ্যা আসত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে নির্দেশ দেন, যেসব গাছ বাগানের দেওয়াল বরাবর রয়েছে সেগুলোর খেজুর তিনি যেন সেই আনসার সাহাবীকে দেন যিনি বাগানের মালিক ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড,পৃ: ৫৩৮) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৮)

এরপর রয়েছে হযরত মুজায্ যার বিন যিয়াদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। মূসা বিন উকবা বর্ণনা করেন, মানুষের ধারণা হলো আবু ইয়াসের আবু বাখতারিকে হত্যা করেছে, কিন্তু অনেকেই বলেছে, মুজায্ যার (রা.)তাকে হত্যা করেছেন। হযরত মুজায্ যার (রা.) অজ্ঞতার যুগে সোয়ায়েদ বিন সামেতকে হত্যা করেছিলেন আর এই হত্যাকাণ্ডই বুআসের যুদ্ধকে উস্কে দিয়েছিল। পরবতীতে হযরত মুজায্ যার (রা.) এবং হযরত হারেস বিন সোয়ায়েদ বিন সামেত (রা.) ইসলামগ্রহণ করেন, কিন্তু হারেস বিন সোয়ায়েদ সুযোগের সন্ধানে ছিলেন যেনতিনি তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্ব রূপ তাকে হত্যা করতে পারেন। ওহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা যখন মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণ করে তখন হারেস বিন সোয়ায়েদ পেছন থেকে তার ঘাড়ে আঘাত করে তাকে শহীদ করেন। হামরাউল আসাদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর হযরত জিব্রাঈল মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হারেস বিন সোয়ায়েদ মুজায্ যার বিন যিয়াদকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছে, তাই মহানবী (সা.)-কে নির্দেশ দেন, হারেস বিন সোয়ায়েদকে আপনি মুজায্ যার বিন যিয়াদ (হত্যার) শাস্তি স্ব রূপ হত্যা করুন। মহানবী (সা.) এমন দিনে (তার কাছে) যান যেদিন কুবায় প্রচণ্ড গরম ছিল। হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে কুবা মসজিদের দরজায় হারেস বিন সোয় ায়েদকে হত্যা করেছিলেন। এটি তাবাকাতুল কুবরার রেওয়ায়েত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৩)(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: পৃ: ৫৭২-৫৭৩)

এরপর রয়েছে হযরত রিফা বিন রাফে বিন মালেক বিন আজলান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। লিখিত আছে, হযরত রিফা বিন রাফে (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুআয বিন রিফা তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত রিফা বিন রাফে (রা.) এবং তাঁর খালাতো ভাই হযরত মুআয বিন আফরা (রা.) বের হয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌঁছেন। তারা দুজন সানিয়া পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসার পর এক ব্যক্তিকে গাছের নীচে বসে থাকতে দেখেন। বর্ণনাকারীর (ভাষ্য) অনুযায়ী এ ঘটনাটি ছয়জন আনসারী সাহাবীর বের হবার পূর্বের ঘটনা, অর্থাৎ আকাবার প্রথম বয়আতের পূর্বের ঘটনা। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তিকেদেখার পর আমরা দেখতে পাই তিনি হলেন, মহানবী (সা.)। তখন আমরা বলি, চলো! এই ব্যক্তির কাছেগিয়ে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জিনিসপত্র তাঁর কাছে রেখে আসি। তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-কে অজ্ঞতার যুগের রীতি অনুযায়ী সালাম করি, কিন্তু তিনি ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালামের উত্তর দেন। তিনি বলেন, আমরা (এক) নবী সম্পর্কে শুনেছিলাম যে, কেউ মক্কায় (নবী হবার) দাবি করেছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে চিনতে পারি নি। আমরা তঁাকে (সা.) জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? তিনি (সা.)বলেন, নীচে নেমে আসুন। অতএব আমরা নীচে নেমে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, সেই ব্যক্তি কোথায় যে নবুয়্যতের দাবি করেছেন আর তিনি যা বলেন (অর্থাৎ তিনি যা-ই হোন না কেন) তা নিজের দাবি অনুযায়ী বলেন। তিনি (সা.) বলেন, আমিই সেই ব্যক্তি। তিনি বলেন, তখন আমি বলি, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। ফলে মহানবী (সা.) আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল, ভূ -মণ্ডল ও পর্বতমালাকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমরা উত্তর দেই, এগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি(সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে আমরা বলি, আল্লাহ্ তা'লা। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু এসব প্র তিমা কে তৈরি করেছে যার ইবাদত তোমরা করো? আমরা উত্তর দেই, এগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করেছি। এ প্রেক্ষিতে তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তাহলে সৃষ্টিকর্তা উপাসনার অধিক যোগ্য না কি যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা? কাজেই তোমরা তো উপাসনার অধিক যোগ্য, কেননা তোমরা প্রতিমাগুলোর স্র ষ্টা। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ র উপাসনা এবং এ সাক্ষ্য প্রদানের প্রতি আহ্বান জানাই যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই আর আমি হলাম আল্লাহ্র

রসূল। এছাড়া আমি পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং শত্রুতা পরিহার করার প্রতি আহ্বান জানাই যা মানুষের অন্যায়ের ফলে সৃষ্টি হয়। তখন আমরা বলি, না, আল্লাহ্ র কসম! যে বিষয়ের প্রতি আপনি আহ্বান করেন তা যদি মিথ্যাও হয় তবুও এগুলো উত্তম বিষয় এবং সর্বোত্তম নৈতিকতা। আপনি আমাদের বাহনগুলোর একটু খেয়াল রাখুন এই অবকাশে আমরা গিয়ে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করে আসি। মুআয বিন আফরা তাঁর (সা.) কাছেই বসে থাকেন।

রিফা বিন রাফে বলেন, অতএব আমি বায়তুল্লাহ্ র তাওয়াফ করতে যাই। আমি সাতটি তির বের করি এবং একটি তির তাঁর (সা.) নামে নির্ধারণ করি । এটি তাদের রীতি ছিল, হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য তারা তিরের মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করতেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বায়তুল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেদোয়া করি, হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মদ (সা.) যে দিকে আহ্বান করছেন তা যদি সত্য হয় তাহলে ৭ বারই তাঁরনামের তির বের করো। আমি ৭ বার শুভাশুভ নির্ণয় করি আর ৭ বারই তাঁর তির বের হয়।

আমি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠি, আশ্ হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ । ফলে মানুষ আমার কাছে একত্রিত হয়ে বলতে থাকে, এই ব্যক্তি উন্মাদ এবং সাবী হয়ে গেছে। তখন আমি বলি, বরং তিনি তো একজন মু'মিন। অর্থাৎ যার কথা তুমি বলছ, সে তো উন্মাদ, সাবী। কিন্তু আমি বলি, না, বরং আমার তো মনে হয় তিনি একজন ঈমানদার মানুষ। এরপর আমি মক্কার উচ্চ ভূমিতে চলে আসি। সুতরাং মুআয আমাকে দেখার পর বলে, রিফা এমন জ্যোতির্ময় চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে যেমনটি যাওয়ার সময় ছিল না।

অর্থাৎ কলেমা পড়ার পূর্বে সেই জ্যোতির্ময় চেহারা ছিল না যেমনটি এখন রয়েছে। অতএব আমি এসে ইসলাম গ্রহণ করি। রসুলুল্লাহ্(সা.) আমাদেরকে সূরা ইউসুফ এবং ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক পাঠ করান। এরপর আমরা ফিরে আসি।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৫-১৬৬)

হযরত রিফা বিন রাফে (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমার চোখে তির বিদ্ধ হয় যার কারণে আমার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) আমার চোখে তার থুথু লাগিয়ে দেন এবং আমার জন্য দোয়া করেন যার ফলে আমার আর কোনো কষ্ট হয় নি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী বদরের যুদ্ধের দিন হযরত রিফা বিন রাফে (রা.)-এর (চোখে) নয়, বরং তির লেগেছিল তার পিতা রাফে বিন মালেকের চোখে। (আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, পৃ: ১৮৭৬)

যাহোক আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, কিন্তু ফলাফল একই ছিল আর তা হলো কষ্ট দূর হয়ে যায়।

হযরত রিফা বিন রাফে (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন মসজিদে বসেছিলেন। আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। এরই মাঝে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে যাকে বেদুঈন মনে হচ্ছিল। সে এসে নামায পড়ে এবং খুবই উদাসীনভাবে পড়ে। এরপর মহানবী (সা.)-এর দিকে ঘুরে তাঁকে সালাম করে তখন মহনবী (সা.) বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক।

আবার গিয়ে নামায পড়ো, কেননা তুমি নামায পড় নি। সে আবার গিয়ে নামায পড়ে। এরপর পুনরায় সে এসে তাঁকে সালাম বলে। তিনি (সা.) আবারও বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক আর বলেন, ফিরে গিয়ে আবারও নামায পড়, কেননা তুমি নামায পড় নি। এভাবে সে দুইবার বা তিনবার যায়। প্রতিবারই সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিত আর মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক এবং প্রতিবারই তিনি (সা.) বলেন, ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ো, কেননা তুমি নামায পড় নি। ফলে লোকেরা ভয় পেয়ে যায় আর এ বিষয়টি তাদের কাছে গুরুভার মনে হয়, কেননা যে ব্যক্তি হালকা নামায পড়ে করে সে নামাযই পড়ে নি। সাহাবা (রা.) সেখানে মহানবী (সা.) পাশে বসেছিলেন তারা খুবই ভীত হন, এর অর্থ হালকা নামায তো কোনো নামাযই নয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরও আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

অবশেষে সেই ব্যক্তি নিবেদন করে, তাহলে আমাকে নামায পড়ে দেখিয়ে দিন এবং আমাকে শিখিয়ে দিন (কীভাবে নামায পড়তে হয়)। আমি তো একজন সাধারণ মানুষমাত্র আমি চেষ্টাও করলেও আমার ভু লভ্রান্তি হয়। ফলে মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে (শুন)! তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়ানোর সংকল্প করো তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ্ যেভাবে ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে ওজু করো। এরপর পবিত্র কুরআনের কোনো অংশ তোমার মুখস্ত থাকলে তা পাঠ করো অন্যথায় আলহামদুলিল্লাহ্ , আল্লাহু আকবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলো। এরপর রুকুতে যাও আর তৃপ্তির সাথে রকু করো। এরপর একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, এরপর সেজদা করো আর অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ সেজদা করো। এরপর বসো আর তৃপ্তির সাথে বসো এরপর (পরবর্তী রাকাতের জন্য) উঠে দাঁড়াও। তুমি এভাবে সব করে নেওয়ার পর তোমার নামায পূর্ণতা পাবে আর তুমি এতে কোনো কিছু কম করলে যতটুকু কম করবে নামাযেও ততটুকু ঘাটতি হবে।

(সুনানুত ইবনে মাজা, কিতাবুত সালাত, হাদীস-৩০২)

হযরত রিফা বিন রাফে (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে বসে ছিলেনতখন তিনি (সা.) বলেন, কারো নামায ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা পায় না যতক্ষণ সে আল্লাহ্ যেভাবে তাকে ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে ওজু না করে। অর্থাৎ সে তার মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, তার মাথা মাসাহ্ করবে এবং তার উভয় পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস-৪৬০)

আরেকটি রেওয়ায়েতে হযরত রিফা বিন রাফে (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) বলেন, তুমি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর পর আল্লাহু আকবার বলো এবং সূরা ফাতেহা পড়ো আর এর সাথে আল্লাহ্র ইচ্ছা মতো পবিত্র কুরআনের ততটুকু তুমি পড়ো যতটা তোমার মুখস্ত আছে বা যতটা তুমি পড়তে চাও । রুকু করার সময় তুমি তোমার উভয় তালু উভয় হাটুতে রাখো এবং তোমার কমর সোজা রাখবে। এছাড়া তিনি (রা.) বলেন, সেজদা করার সময় তুমি তৃপ্তিসহকারে সেজদা করো আর (সেজদা থেকে) মাথা উঠানোর পর তুমি বাম রানের ওপর বসো। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৮৫৯)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হযরত উসায়েদ বিন মালেক বিন রাবিআ (রা.)-এর। উসমান বিন উবায়দুল্লাহ্ রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি আবু উসায়েদ (রা.)কে দেখেছি তিনি তার দাড়িতে বাসন্তী রঙ লাগাতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২১)

ইবনে ইসহাক বলেন, আবু উসায়েদ বিন মালেক বিন রাবিআ (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার জীবনের শেষ দিকে যখন দৃষ্টি শক্তি চলে যায় তখন তিনি বলেন, আমি যদি আজ বদরের প্রান্তরে থাকতাম আর আমার দৃষ্টিশক্তিও যদি ভালো থাকত তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই উপত্যকা দেখাতাম যেখানথেকে ফেরেশতা বাহিনী বেরিয়েছিল। এতে আমার সামান্যতম সন্দেহও নেই।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩১)

আবু উসায়েদ বিন মালেক বিন রাবিআ সা'দি (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েত হলো, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে বসেছিলাম, ঠিক তখনই বনু সালামা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহর রসূল(সা.)! আমার পিতামাতার মৃ ত্যুর পরও কি কোনোভাবে তাদের সাথে সদাচরণ করার সুযোগ আছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তাদের জন্য দোয়া করবে, তাদের জন্য ইস্তেগফার করবে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের ওয়াদা পূর্ণ করবে, তাদের উভয়ের আত্মীয়স্বজনের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তাদের সাথেসম্পর্ক অটুট রাখবে আর তাদের বন্ধু বান্ধবকে সম্মান করবে। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৫১৪২)

এভাবে তারাও পুণ্য পেতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের আত্মাও পুণ্য লাভ করতে থাকবে এবং তাদের ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি হতে থাকবে।

মালেক বিন রাবিআ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ্ ! যারামাথা মুণ্ডন করে তাদের ক্ষমা করো। তখন এক ব্যক্তি নিবেদন করে, যারা চুল ছাটে তারা? উত্তরে তিনি (সা.) তৃতীয় বা চতুর্থবার বলেন, আর যারা চুল ছাটে তাদেরও (ক্ষমা করো)। সেদিন আমিও মাথা মুণ্ডন করে রেখেছিলাম। একথা শুনে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা লাল উট বা বিপুল সম্পদ পেলেও পেতাম না।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

উসমান বিন আরকাম তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেন, তোমাদের কাছে যুদ্ধলব্ধ যে সম্পদ আছে তা ছেড়ে দাও। তখন হযরত আবু উসায়েদ আস্ সা'দি (রা.) আয়েযুল মুরযুবানের তরবারি রেখে দিলে হযরত আরকাম তা হাতে তুলে নিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! এটি আমাকে দিয়ে দিন। ফলে তিনি (সা.) তাকে সেই তরবারি দিয়ে দেন।

(মারিফাতিস সাহাবা লি আবি নাঈম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৫, হাদীস-১০২২)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল আসাদ (রা.)-এর। একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন উম্মারাহ্ বলেন, মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের নিকট হযরত আবু সালামা বিন আব্দিল আসাদ (রা.) আসেন। তিনি ১০ মহর্রম মদিনায় আসেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) ১২ই রবিউল আউয়াল মদিনায় আগমন করেন। যেসব মুহাজের সর্বপ্রথম আসেন তারা বনু আমর বিন আউফের সাথে অবস্থান করেন এবং যেসব মুহাজের শেষে এসেছেন তাদের আগমনের

মাঝে দুই মাসের ব্যবধান রয়েছে।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু সালামা (রা.) মদিনাতে হিজরতের সময় কুবায় হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযের (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু সালামা বিন আব্দিল আসাদ এবং সা'দ বিন খায়সামার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮১)

বনু তায় গোত্রের এক ব্যক্তি নিজ ভাতিজীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদিনায় এসেছিল সে যখন মহানবী (সা.)-কে এই সংবাদ দেয় যে, খোয়াইলিদের পুত্র তুলায়হা ও সালামা স্বীয় গোত্র এবং মিত্রদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজ গোত্র এবংসেসব লোককে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিচ্ছে তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু সালামা, অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দিল আসাদ (রা.)কে ডেকে বনু আসাদকে শায়েস্তা করতে ১৫০মুহাজের ও আনসারের নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। আর তাকে একটি নিশান, অর্থাৎ পতাকা তৈরী করে দেন এবং যে ব্যক্তি বনু আসাদ সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়েছিল তাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সাথে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু সালামা (রা.)কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি সামনে অগ্রসর হয়ে বনু আসাদের অঞ্চলে গিয়ে শিবির স্থাপন করবে। তারা সৈনসামান্ত নিয়ে তোমাদের মোকাবিলা করার পূর্বেই তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ করবে। সুতরাং এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আবু সালামা (রা.) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রচলিত পথ পরিহার করে দিন-রাত যাত্রা করেন যেন বনু আসাদ তাদের অভিযানের সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই তারা আকস্মিকভাবে তাদের সামনে উপস্থিত হতে পারেন। পরিশেষে তারা সফর করে বনু আসাদ গোত্রের একটি ঝর্ণার নিকট পৌঁছেন আর গবাদিপশুর চারণভূমিতে আক্রমন করেন এবং ৩ জন রাখালকে আটক করেন। বাকি লোকেরা জীবন বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। হযরত আবু সালামা (রা.) তার সেনাদলকে তিনটি দলে ভাগ করেন। একটি দলকে নিজের কাছে রেখে অবশিষ্ট দু টি দলকে আশেপাশে পাঠিয়ে দেন। তারা আরো কিছু উট ও ছাগল ধরে নিয়ে আসে কিন্তু কো নো ব্যক্তিকে আটক করতে পারে নি। এরপর হযরত আবু সালামা (রা.) মদিনায় ফিরে আসেন। এটি সীরাতে হালবিয়ার উদ্ধৃতি। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩১)

আমর বিন সালামা (রা.) বলেন, হযরত আবু সালমা (রা.) বদরের যুদ্ধ এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর আবু উসামা জোশামী ওহুদের যুদ্ধে তাঁকে আহত করে। সে আবু সালামার বাহুতে বর্শা দ্বারা আঘাত করে। হযরত আবু সালামা (রা.) এক মাস পর্যন্ত সেই ক্ষতের সুশ্রুষা করতে থাকেন এবং বাহ্যত তা ভালোও হয়ে যায়, ক্ষত (এমনভাবে) ভরে হয়ে যায় যে কেউ এর অভ্যন্তরের বিষক্রিয়া দেখতে পায় নি। মহানবী (সা.) হিজরতের পঁয়ত্রিশতম মাসে অর্থাৎ মুহর্‌রম মাসে তঁ াকে (রা.) একটি যুদ্ধাভিযানে কাতন বিন বনু আসাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কাতনের বিষয়ে বলা হয়, আনিযা বলেন, নাজাদ এবং খায়বারের মাঝে এক পাহাড়ী অঞ্চল যার উত্তর দিকে বনু আসাদ বিন খুযায়মার বসতি ছিল। যাহোক তিনি (রা.) দশের অধিক রাত মদীনার বাইরে অবস্থানের পর প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর (রা.) ক্ষতস্থানে বিষক্রিয়া শুরু হয় আর তিনি (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ০৩ জমাদিউল আখের, ৪র্থ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮২)

আবু কিলাবা (রহ.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) (অসুস্থ) হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.)-কে দেখতে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর আগমনের সাথে সাথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, এর ফলে সেখানের মহিলারা কিছু একটা বলে যার প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) বলেন, থামো! নিজেদের প্রাণের জন্য কল্যাণ কামনা বৈ অন্য কোনো দোয়া করো না কেননা ফিরিশতা মৃত ব্যক্তির পাশে উপস্থিত থাকে অথবা বলেছেন (ফিরিশতা) মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের পাশে (উপস্থিত থাকে)। তাদের দোয়ায় ফিরিশতারা আমীন বলে তাই নিজেদের কল্যাণের জন্য বৈ অন্য কোনো দোয়া করো না। (আহাজারি বা মাতমকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় সিয়াপে করা বলে)- এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। এরপর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তার জন্য তার কবর প্রশস্ত করে দাও আর তার জন্য কবরের মাঝে আলোকিত করে দাও আর তার নূরকে বৃদ্ধি করে দাও এবং তার দোষত্রুটি ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! সঠিক পথপ্রাপ্ত লোকদের মাঝে তার মর্যাদা উন্নীত করো। তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হও। আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা করো হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক! এরপর বলেন, যখন আত্মা বের হয় তখন দৃষ্টি এর পশ্চাতে থাকে, তোমরা কি তাঁর চোখ খোলা দেখছ না?

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

এরপর স্মৃতিচারণ হবে হযরত খাল্লাদ বিন রাফে আযযুরকী (রা.)-এর। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। হযরত খাল্লাদ বিন রাফে ছিলেন আনসারের বনু খাযাজ গোত্রের শাখা গোত্র আজলানের।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭২)

তার মায়ের নামছিল উম্মে মালেক বিনতে উবাই বিন মালেক। হযরত খাল্লাদের পুত্রের নাম ছিল ইয়াহইয়া যিনি উম্মে রাফে বিনতে উসমান বিন খালদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার সকল সন্তান মৃত্যুবরণ করে, ইতিহাসে (শুরুতেই) এমনটি লেখা আছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৭)

যেভাবে নামায পড়ার বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে দু'তিনবার বলেছিলেন যে, পুনরায় নামায পড়ো। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) মসজিদে প্রবেশ করলেন, ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায আদায় করল। নামায শেষে সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে সালাম দিল। মহানবী (সা.) সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, নিজ অবস্থানে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো। আর এভাবে সেই ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি (নামায পড়ে) ফিরে এলে তাকে পুনরায় বললেন, নিজ জায়গায় যাও এবং আবার নামায পড়ো (এই হাদীসটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।) এরপর সেই ব্যক্তি বলল, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে উত্তম নামায পড়তে পারি না তাই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি (সা.) বললেন, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে, এরপর পবিত্র কুরআনের যে অংশ তোমার মুখস্ত আছে সেটি পাঠ করবে, এরপর রুকু করবে অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর যা মুখস্ত আছে তা। এরপর রুকুতে গিয়ে তুমি পরিতৃপ্ত হলে মাথা তুলবে এরপর প্রশান্তচিত্তে দাঁড়িয়ে যাবে অতঃপর সিজদা করবে এমনকি যখন তুমি সিজদায় পরিতৃপ্ত হবে তখন মাথা তুলবে এরপর প্রশান্তচিত্তে বসে যাবে। মোটকথা তোমার সমস্ত নামায এভাবেই আদায় করবে। (সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭৫৭)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, যার সাথে এই ঘটনাটি ঘটেছে তিনি হলেন হযরত খাল্লাদ বিন রাফে (রা.)।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৫৮)

এরপর স্মৃতিচারণ হবে হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-এর। খন্দকের যুদ্ধে হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) যথেষ্ট সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন। উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি খন্দকে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম আর কোনো অবস্থাতেই তাঁর থেকে পৃথক হই নি। তিনি (সা.) নিজেও খন্দকের তদারকি করেছেন। প্রচণ্ড শীতে আমরা (কাতর) ছিলাম, আমি তাঁকে (সা.) দেখছিলাম, তিনি উঠলেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যতটুকু সম্ভব তিনি নিজ তাবুতে গিয়ে নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (সা.) বাইরে এসে কিছুক্ষণ চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর আমি তাঁকে (সা.) বলতে শুনলাম যে, এরা মুশরিকদের অশ্বারোহী যারা পরিখা প্রদক্ষিণ করছে, তাদের প্রতি কে দৃষ্টি রাখবে? তখন তিনি (সা.) ডেকে বললেন, হে আব্বাদ বিন বিশর! হযরত আব্বাদ (রা.) জবাবে বললেন, (হে আল্লাহ্‌র রসূল) আমি উপস্থিত। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে আর কেউ কি আছে? তিনি (রা.) উত্তরে বলেন হ্যা, আমি আমার কিছু সঙ্গীসহ আছি। আমরা আপনার তাঁবুর আশেপাশে আছি। তিনি (সা.) বললেন, তোমার সঙ্গীদের নিয়ে যাও এবং পরিখার চারপাশে চক্কর দাও। এরা মুশরিকদের অশ্ব ারোহীদের মাঝে কিছু অশ্বারোহী যারা ঘুরে ঘুরে তোমাদেরকে নীরিক্ষণ করছে এবং তারা ইচ্ছা রাখে যে, তোমরা সামান্য অমনোযোগী হলেই তারা তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতঃপর তিনি (সা.) দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের থেকে তাদের অনিষ্ট দূর করে দাও এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো এবং তাদের পরাজিত করো। তুমি ছাড়া তাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না।

তখন হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) নিজ সঙ্গীদের নিয়ে বের হলেন এবং দেখলেন যে, আবু সুফিয়ান মুশরিকদের কিছু অশ্বারোহীদের সাথে আছে এবং সে পরিখার সংকীর্ণ স্থানের আশপাশে চক্কর দিচ্ছে। খন্দকের পাড়ে বসে থাকা মুসলমানরা তাদের বিষয়ে জেনে গিয়েছিল। মুসলমানরা তাদের দিকে পাথর ও তির নিক্ষেপ করে আর আমরাও তাদের সাথে যুক্ত হলাম এবং আমরাও তাদের দিকে তির ছুঁড়তে থাকি এমনকি আমরা তির নিক্ষেপ করে মুশরিকদেরকে তাদের অবস্থান থেকে সরেযেতে বাধ্য করি এবং তারা নিজ প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরে যায় এবং আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁকে সালাতরত অবস্থায় পেলাম। (নামায শেষ হলে) আমি তাঁকে এ ঘটনার বিস্তারিত অবহিত করলাম। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, তারপর তিনি (সা.) ঘুমিয়ে গেলেন এমনকি আমি তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। আর আমি যতক্ষণ হযরত বেলালকে ফজরের আজান দিতে না

শুনেছি ততক্ষণ তিনি (সা.) ঘুম থেকে জাগ্রত হন নি। অবশেষে ভোরের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনি (সা.) (তাবু থেকে) বের হয়ে আসলেন এবং মুসলমানদের নামায পড়ালেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করতেন, আল্লাহ্ তা'লা আব্বাদ বিন বিশর (রা.) -এর প্রতি কৃপা করুন, তিনি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাঁর তাঁবুর সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন এবং সর্বদা এর সুরক্ষা করতে থেকেছেন।

(কিতাবুল মাগাযি, লিল ওয়াকাদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৬-৩৯৭)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলতেন, আনসারদের মধ্য থেকে তিনজন অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.), দ্বিতীয়ত হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) আর তৃতীয়ত হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)। "(সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ২২৯)

কিবলা পরিবর্তনের বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত আছে যেখানে হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-এর নামও দেখা যায়। হযরত তুয়ায়লা (রা.) বর্ণিত হাদীস, [তিনি (রা.) বলেন] আমরা বনু হারেসায় যোহর ও আসরের নামায আদায় করছিলাম আর দুই রাকাত বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরে পড়েছিমাত্র তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল আর বলল, কিবলা মসজিদুল হারামের দিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, এরপর আমরা আমাদের স্থান পরিবর্তন করে নিলাম আর পুরুষরা মহিলাদের জায়গায় চলে গেল আর মহিলারা পুরুষের জায়গায় চলে আসলো। একটি রেওয়ায়েত আনু সারে তথ্যদাতা এই ব্যক্তির নাম আব্বাদ বিন বিশর বিন কায়যি (রা.) ছিলেনযিনি বনু হারেসা গোত্রের সদস্য ছিলেন। অথচ অন্য একটি ভাষ্য অনুসারে এই ব্যক্তি ছিলেন আব্বাদ বিন বিশর বিন ওয়াখশ যিনি বনু আব্দিল আশআল গোত্রের সদস্য ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮-১৪৯)

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মক্কার কুরায়েশদের পক্ষ থেকে সোহেল বিন আমর যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলার জন্য আসে তখনও আব্বাদ বিন বিশর মহানবী (সা.)-এর পাশে লোহার বর্ম পরিহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এছাড়া তার সাথে আরেকজন সাহাবী হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)ও ছিলেন। আলোচনার সময় সোহেলের কণ্ঠস্বর উঁ চু হলে হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) তাকে বলেন, রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে তোমার গলার স্বর নীচু রাখ।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫২)

হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) [মহানবী (সা.)-এর সাথের] প্রতিটি যুদ্ধেই প্রথম সাড়িতে থাকেন। একবার উয়ায়না বিন হিসন ফাযারী বনু গুতফানের কিছু আশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে গাবায় আক্রমণ করে যেখানে মহানবী (সা.)-এর দুধের উটনীগুলো চরত। তারা উটনীগুলো দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী ও মহাবনী (সা.)-এর উটগুলোকে সাথে নিয়ে যায়। এ সংবাদ মদিনায় পৌঁছার পর অশ্বারোহীরা মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হতে থাকে। রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, আনসারদের মধ্য থেকে হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-এর পর সর্ব প্রথম হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) মহানবী (সা.) কাছে আসেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, খণ্ড-৩-৪, পৃ: ১৭৪)

এই অভিযানটি গাযওয়া কারদ নামে খ্যাত। এর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারীতেও এসেছে। ইয়াযিদ বিন আবি উবায়েদের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি বলেন, আমি হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন- আমি ফজরের আযানের পূর্বে মদিনাথেকে বের হয়ে গাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর দুধের উটগুলো যি কারদে চরছিল। তিনি বলতেন, আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)-এর এক পু ত্রের সাথে পথে আমার সাক্ষাৎ হলে সে বলে, তারারসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর উট নিয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করি, কে নিয়ে গেছে? সে উত্তর দেয়, গাতফান গোত্রেরলোক বলছিল। একথা শোনামাত্রই আমি চিৎকার করে তিনবার বলি, 'ইয়া সাবা' আর তাদেরকে সতর্ক করে দিই যারা মদিনার দুটি পাথুরে ভূখণ্ডে অবস্থান করছিল। এরপর আমি একটি ভোঁ-দৌড় দিয়ে তাদের নাগাল পেয়ে যাই আর (তখন) তারা সেই পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। আমি তাদের লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করি আর আমি একজন দক্ষ তিরন্দাজ ছিলাম। এছাড়া আমি এ পঙতি পড়ছিলাম যে, আমি অকু য়ার পু ত্র, আজ সেই দিন যেদিন বুঝা যাবে দুধ পান করানো মায়েরা কাকে দুধ পান করিয়েছেন। আমি হুঙ্কার দিয়েপঙতি বা কবিতা পড়ছিলাম। এভাবে আমি তাদের কাছ থেকে সবগুলো দুধের উটনী ছাড়িয়ে নেই এবং তাদের কাছ থেকে ৩০টি চাদরও ছিনিয়ে নেই। তিনি বলতেন, আমি এ অবস্থায়ই ছিলাম এমন সময় মহানবী (সা.)অন্য লোকদের সাথে নিয়ে চলে আসেন। আমি বলি, হে আল্লাহর নবী! আমি তাদেরকে পানিও পান করতে দিই নি আর তারা পিপাসার্ত ছিল। আপনি তাদের উদ্দেশ্যে এখনই একটি দল প্রেরণ করুন। তখন তিনি (সা.) বলেন, হে অকু য়ার পু ত্র! তুমি তাদেরকে পরাস্ত করেছ, তাই নমনীয়তা অবলম্বন করো।

হযরত আকুয়া(রা.) বলতেন, এরপর আমরা ফিরে আসি এবং রসূলু ল্লাহ্ (সা.) আমাকে তাঁর উটনীতে নিজের পিছনে বসিয়ে নেন আর এ অবস্থায়ই আমরা মদিনায় প্রবেশ করি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১৯৪)

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো হাতেব বিন বালতা (রা.)-এর। ৩০ হিজরী সনে তিনি ৬৫ বছর বয়সেমদিনায় মৃত্যু বরণ করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৪))

তার সম্পর্কে আরো লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.)ও তাকে মিশরে মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করেন আর (তিনি) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা হযরত আমর বিন আস (রা.) মিশর আক্রমণের পূর্ব পর্য ন্ত উভয় পক্ষের মাঝে বলবত ছিল।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

হযরত হাতেব (রা.) সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন, পাতলা দাড়ি ছিল। তার গ্রীবা ছিল নত এবং আঙুলগুলোমোটা মোটা। ইয়াকুব বিন উতবা থেকে বর্ণিত, হযরত হাতেব বিন বালতা তার মৃত্যুর সময় চার হাজার দীনার ও দিরহাম রেখে গিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন ধরণের খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ী ছিলেন আর তিনি তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি মদিনায় রেখে গেছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত হাতেব (রা.)-এর দাস রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে। দাস বলে, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, সে কখনোই এতে প্রবেশ করবে না, কেননা সে বদরের যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিল। (সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৮৬৪)

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতা (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (তখন) তিনি বাজারে কিসমিস বিক্রি করছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, নিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করুন নয়তো আমাদের বাজার থেকে চলে যান। আরো লিখেন, হযরত ইমাম শাফী থেকে বর্ণিত, কাসেম বিন মুহাম্মদ বলেন, হযরত উমর (রা.) ঈদগাহের বাজারে হযরত হাতেব (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার সামনে দুই ঝুড়ি ভর্তি কিসমিস ছিল। হযরত উমর (রা.) তার পণ্যের মূল্য জিজ্ঞেস করলে তিনি (রা.) বলেন, এক দিরহামে দুই মদ্দ দিচ্ছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, তায়েফ থেকে আগত একটি কাফেলার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, তারা আপনার মূল্যের ওপর আস্থা রাখে। তাই হয়আপনি মূল্য বৃদ্ধি করুন অন্যথায় বাড়িতে বসে যেভাবে ইচ্ছে বিক্রি করুন। অতএব হযরত উমর (রা.) বাড়ি ফিরে চিন্তাভাবনা করার পর হযরত হাতেব (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তঁ ার বাড়িতে যান এবং বলেন, আপনাকে আমি যাকিছু বলেছিলাম তা আমার পক্ষ থেকে কোনো জবরদস্তি ও নয় আর তা আমার পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্তও ছিল না। আমি এই কথাগুলো কেবল নাগরিকদের কল্যাণের জন্যে বলেছিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছে বিক্রি করুন এবং যত মূল্যে ইচ্ছে বিক্রি করুন।

(সুনান আল কবীর লিল বাইহাকি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস-১১১৪৬)

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই ইসলামী সরকার পবিত্র মদিনায় পণ্যসামগ্রীর মূ ল্য নিয়ন্ত্রণ করত। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) একবার মদিনার বাজারে ঘুরছিলেন এমন সময় দেখেন, হাতেব বিন আবি বালতা নামের এক ব্যক্তি বাজারে দুই বস্তা শুকনো আঙ্গুর নিয়ে বসে আছে। হযরত উমর (রা.) তার কাছে মূল্য জিজ্ঞেস করলে তিনি (রা.) বলেন, এক দিরহামে দুই মদ্দ। এই মূল্য বাজারের সাধারণ মূল্য হতে সস্তা ছিল। ফলে হযরত উমর (রা.) তাকে নির্দেশ দেন, আপনার বাড়ি গিয়ে বিক্রি করুন কিন্তু বাজারে এত সস্তা মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন না। কেননা এতে বাজারমূল্য নষ্ট হয়ে যায় এবং বিক্রেতাদের প্রতি মানুষের মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)লিখেন, ফিকাহবিদরা এ বিষয় নিয়ে অনেক বিতর্ক করেছেন। কেউ কেউ এমন রেওয়ায়াতও বর্ণনা করেছেন, পরবতীতে হযরত উমর (রা.) নিজের এই চিন্তা পরিবর্তন করেছিলেন কিন্তু সাধারণভাবে ফিকাহবিদরা হযরত উমর (রা.)-এর মতামতকে কার্যকর নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই তারা লিখেছেন, ইসলামী সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, তারা যেন মূল্য নির্ধারণ করে দেয় অন্যথায় জাতির নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততায় পরিবর্তন সৃষ্টি হবে। তবে এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে সেসব পণ্যসমগ্রীর উল্লেখ রয়েছে যা বাজারে বিক্রয় হয়, কিন্তু যেসব পণ্য বাজারে

আহমদীয়া জামাতের উন্নতি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহামসমূহ

-জামাল শরীয়ত, মুরুব্বী সিলসিলা, কাদিয়ান

জামাতের উন্নতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই লক্ষ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং তাঁর শিক্ষার প্রসার সম্পর্কিত একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী সেই সময় পূর্ণতা পেয়েছিল যখন তা পূর্ণ হওয়ার কোনও বাহ্যিক উপকরণ ছিল না। বরং এর বিপরীতে বিরুদ্ধবাদীরা সেই শিক্ষার প্রসারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল এবং পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চাইছিল। সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল, 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।'

(তাযকেরা, পৃ: ৩১২, ৪র্থ সংস্করণ)

আমি তোমার একনিষ্ঠ ও আন্তরিক বন্ধুদের জামা'তকে বড় করবো এবং তাদেরকে ধনসম্পদ ও জনবলে উন্নতি দিবো, আর এক্ষেত্রে তাদের প্রাচুর্য দান করবো।'

(তাযকেরা, পৃ:১৪১)

(আল্লাহ্ তা'লা) একে (আহমদীদের দলকে) বিস্তৃতি দান করবেন, এমনকি তাদের আধিক্য এবং বৃদ্ধিলাভ আপাত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর বলে মনে হবে। ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক'।

(তাযকেরা, পৃ: ৪৭৬)

অর্থাৎ, পৃথিবীর সকল দেশ থেকে মানুষ তোমার জামা'তভুক্ত হওয়ার জন্য আসবে। 'ইন্না আতাইনা কাল কাউসার' (সূরা কওসার: ১)অর্থাৎ, আমরা তোমাকে সকল ক্ষেত্রে প্রাচুর্য দান করব, যার মাঝে জামা'তও অন্তর্গত। ইংরেজিতেও তাঁর প্রতি এ সম্পর্কে ইলহাম হয়েছে যে, I will give you a large party of Islam আমি তোমাকে মুসলমানদের একটি বিশাল জামা'ত দান করবো। তোমাকে পূর্ববতীদের মধ্য থেকেও একটি বিশাল জামা'ত দেওয়া হবে, আর পরবতীদের মধ্য থেকেও। (সূরা ওয়াকেয়া: ৪০-৪১) এর একটি অর্থ হলো, পূর্ববতী নবীদের উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় গোষ্ঠী তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর মুসলমানদের ভেতর থেকেও একটি বিশাল গোষ্ঠী তোমার প্রতি ঈমান আনবে। পৃথিবীবাসী বলবে, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি তোমাকে চিনতাম না। অর্থাৎ, আমরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবো আর একে এর প্রান্ত থেকে গ্রাস করবো। এই ইলহামগুলোর বেশ কয়েকটি এমন সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন তাঁর প্রতি কেউ ঈমান আনে নি তখনই তা ছাপিয়ে দেওয়া হয়। আর কতক পরে হয়, যখন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু, তাও এমন সময় হয় যখন জামা'ত প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। তখন তাঁর এ মর্মে ইলহাম ছাপিয়ে দেওয়া যে, একটি সময় এমন আসবে যখন একটি বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে থাকবে। আর শুধু ভারতেই নয়, বরং সকল দেশে তাঁর ভক্তকুল ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অনেক উন্নতি দিবেন। কোনো দেশের মানুষ তাঁর তবলীগ বা প্রচারের গন্ডি-বহির্ভূত থাকবে না। এটি কি সামান্য কথা! অনুমানের ভিত্তিতে মানুষ এমন কথা বলতে পারে কি? .....

অবশেষে তাই হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। সে-ব্যক্তি যাকে তার নিজ অঞ্চলের মানুষও জানতো না; সে নিঃসঙ্গ, একটি ছোট ও অপ্রশস্ত উঠানে হেঁটে হেঁটে স্বীয় ইলহাম লিখছিল এবং সারা বিশ্বে নিজ গ্রহণযোগ্যতার সংবাদ দিচ্ছিল, সে সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে দন্ডায়মান হয় এবং মেঘমালার ন্যায় গর্জে উঠে, মানুষের চোখের সামনে হিংসুক ও শত্রুসারি বিদীর্ণ করে সমগ্র আকাশে ছেয়ে যায়।

ভারতে তা বর্ষিত হয়, আফগানিস্তানে বর্ষিত হয়, আরব, মিশর, শ্রীলঙ্কা, বোখারা, পূর্ব আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরালিওন এবং অস্ট্রেলিয়ায় তা বর্ষিত হয়। ইংল্যান্ড, জার্মানী ও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলকে পরিতৃপ্ত করে এবং আমেরিকায় গিয়ে তা পানি সিঞ্চন করে!আজকে পৃথিবীর এমন কোনো মহাদেশ নেই, যেখানে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'ত নেই। আর এমন কোনো ধর্ম নেই যে ধর্ম থেকে নিজের অংশ কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নেয় নি। খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসী, শিখ ও ইহুদী, এককথায় সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে।

ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তিনি পূর্বে যা ঘোষণা করেছেন তা যদি খোদার বাণী না হতো, তাহলে কীভাবে পূর্ণ হলো? এটি কি অদ্ভুত কথা নয় যে, সেই ইউরোপ ও আমেরিকা যা ইতিপূর্বে ইসলামকে গ্রাস করছিল, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এখন ইসলাম তাদেরকে গ্রাস করছে; আর এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় তাদের কয়েকশ' মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে? রাশিয়া, জার্মানী এবং ইতালিরও কতক মানুষ এই জামা'তকে গ্রহণ করেছে। সেই ইসলাম যা অন্য ফিরকার হাতে উপর্যুপরি পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল, এখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে সকল ক্ষেত্রে শত্রুকে পরাস্ত করছে আর মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপ্রালক আল্লাহ্‌র।

(দাওয়াতুল আমীর, পৃ: ৩৪৮-৩৫০)

সকল ধর্ম হতে বেরিয়ে মানুষ তাঁর জামা'তভুক্ত হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ থেকে মানুষ তোমার জামাতে যোগদান করার জন্য আসবে।

(তাযকেরা, পৃ: ৪৭৬)

আমি তোমাকে প্রতিটি বিষয়ে প্রাচুর্য দান করব যার মধ্যে জামাতও অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে ইংরেজিতেও তাঁর উপর ইলহাম হয়-

I will give you a large party of Islam

(তাযকেরা, পৃ: ১০৩)

আমি তোমাকে মুসলমানদের একটি বড় জামাত দান করব। 'সুল্লাতুম মিনাল আওয়ালীন ও সুল্লাতুন মিনাল আখারীন'। পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও একটি বৃহত জামাত তোমাকে দেওয়া হবে আর পশ্চাদবতীদের মধ্য থেকেও। একটি বিশাল জামাত তোমার উপর ঈমান আনবে এবং মুসলমানদের মধ্য থেকেও একটি বড় জামাত তোমার উপর ঈমান আনবে।

(তাযকেরা: পৃ: ৪৬৬)

আমরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হব আর এটিকে এর প্রান্ত ধরে খেতে খেতে আসব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর এই ইলহামগুলির উল্লেখ করার পর সেগুলি স্বমহিমায় পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে বলেন-

কাদিয়ানের উন্নতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীহযরত আকদাসকে বলা হয়েছে, কাদিয়ান গ্রামটি উন্নতি করতে করতে বোম্বে [মুম্বাই] ও কলকাতার মতো এক বিশাল শহরে পরিণত হবে। অর্থাৎ, এর জনবসতি উত্তর-পূর্বে প্রসারিত হয়ে কাদিয়ান হতে নয় মাইল দূরবর্তী বিয়াস নদীর অববাহিকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ।

কাদিয়ানের উন্নতির বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে বলা হয়েছে যে, কাদিয়ান উন্নতি করতে করতে কোলকাতা ও মুম্বাইয়ের মত এক বিশাল শহরে পরিণত হবে। অর্থাৎ নয়-দশ লক্ষ জনসংখ্যার শহরে পরিণত হবে আর এর জনসংখ্যা উত্তর ও পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়ে বিপাশা নদীর অববাহিকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

(তাযকেরা, পৃ: ৭৮২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) কাদিয়ানের প্রাথমিক যুগের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেন-

এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন ছাপা হয় তখন কাদিয়ানের জনসংখ্যা ছিল দু'হাজারের কাছাকাছি। কয়েকটি পাকা ঘরবাড়ি ছাড়া বাকি সবই ছিল মাটির বা কাঁচা ঘর। ভাড়া এত কম ছিল যে, মাসিক চার-পাঁচ আনায় ঘর ভাড়া পাওয়া যেতো। ভিটেবাড়ি বা গৃহ নির্মাণের জমি এত সস্তা বা সুলভ ছিল যে, দশ-বার রুপীতে বসবাসযোগ্য গৃহ নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি পাওয়া যেতো। তখনকার বাজারের চিত্র হলো, দুই-তিন রুপীর আটা একসঙ্গে পাওয়া যেতো না। অধিকাংশ মানুষ যেহেতু কৃষক শ্রেণীর ছিল তাই নিজেরাই গম পিষে রুটি বানাতো। শিক্ষার জন্য একটি সরকারি মাদ্রাসা ছিল, যার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রাইমারি (প্রাথমিক) পর্যন্ত। মাদ্রাসার শিক্ষক কিছুভাতা নিয়ে ডাকখানার কাজও করে দিত। ডাক আসত সপ্তাহে দু'বার। সব ঘর ছিল শহরের চার দেওয়ালের ভেতর। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার বাহ্যিক কোনো ব্যবস্থা ছিল না; কেননা, কাদিয়ান রেল-সংযোগ থেকে এগার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; আর পুরো রাস্তা ছিল কাঁচা। যেসব দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে সেখানে রেললাইনের সন্নিকটবর্তী শহরগুলোর জনসংখ্যাই সাধারণত বৃদ্ধি পায়। কাদিয়ানে কোনো প্রকার কল কারখানা ছিল না, যার কারণে শ্রমিকদের বসবাসের সুবাদে শহরের উন্নতি হতে পারতো। কাদিয়ানে কোনো সরকারি অফিস বা দপ্তর ছিল না, যার কারণে কাদিয়ানের উন্নতি হতে পারতো। কোন জেলা-দপ্তর ছিল না, তহসীলের নিজস্ব কোনো জায়গা ছিল না, এমনকি কোনো পুলিশ ফাঁড়িও ছিল না। কাদিয়ানে কোনো বাজারও ছিল না, যা এখানকার জনবসতির উন্নতিতে সহায়ক হতে পারত।। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তখন হযরত আকদাস (আ.)-এর ভক্তদের সংখ্যা কয়েকশ'র অধিক ছিল না, যাদের হয়ত এখানে এসে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারত;

ফলশ্রুতিতে শহর বড় হওয়ার সুযোগ থাকত।

(দাওয়াতুল আমীর, পৃ: ৩৩৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিকূল পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও আজ কাদিয়ান যতটা উন্নতি করেছে তা প্রত্যেক চাক্ষুষমান ও ন্যায়নিরপেক্ষ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) কাদিয়ানের উন্নতি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ভবিষ্যদ্বাণী স্বমহিমায় পূর্ণ হওয়ার উল্লেখ করে বলেন,

"বস্তুত, সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোনো বাহ্যিক উপকরণের অবর্তমানে হযরত আকদাস (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কাদিয়ান অনেক উন্নতি করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাপার পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তকে উন্নতি দেওয়া আরম্ভ করেন। একইসঙ্গে তাদের হৃদয়ে কাদিয়ানে এসে বসতি স্থাপনের বাসনা সৃষ্টি করেন। কোনো বিশেষ অনুপ্রেরণা ছাড়াই তারা শহর-বন্দর পরিত্যাগ করে কাদিয়ান এসে বসবাস আরম্ভ করেন আর তাদের পাশাপাশি অন্যরাও এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। এখনও এই ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি বাস্তবায়নে সময় লাগবে; কিন্তু যতটা হয়েছে তাও আশ্চর্যজনক ব্যাপার।.....

অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাদিয়ান সেই উন্নতি করেছে যার দৃষ্টান্ত ধরাপৃষ্ঠে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের উন্নতির জন্য যে নীতি নির্ধারিত আছে তার বিপরীত পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও এটি উন্নতি করে খোদার বাণীর সত্যতা প্রকাশ করেছে, যার মাধ্যমে যারা কাদিয়ানের প্রাথমিক অবস্থা ও পরিস্থিতিকে জানে তারা ভিন্নধর্মের অনুসারী হলেও একথা মানতে বাধ্য যে, নিঃসন্দেহে এটি অসাধারণ একটি দৈব ব্যাপার। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় হলো, মানুষ ভাবে না, সমস্ত অলৌকিক দৈব দুর্বিপাক কি শুধু মির্যা সাহেবের পক্ষেই কাজ করবে?

(দাওয়াতুল আমীর, পৃ: ৩৩৭-৩৩৮)

আর্থিক সাহায্য সম্পর্কিত ইলহাম

আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দেন- 'ইয়ানসুরুকাল্লাহু ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুহি ইলাইহিম মিনাস সামায়ে। অর্থাৎ খোদা নিজ সন্নিধান হতে তোমাকে সাহায্য করবেন এবং সেই সব মানুষ তোমাকে সাহায্য করবে যাদেরকে আমরা উর্ধ্বলোক থেকে ওহী করব। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে এই সংবাদ দান করেছিলেন- 'আমি তোমার একনিষ্ঠ ও আন্তরিক বন্ধুদের জামা'তকে বড় করবো এবং তাদেরকে ধনসম্পদ ও জনবলে উন্নতি দিবো, আর এক্ষেত্রে তাদের প্রাচুর্য দান করবো।'

(তবলীগে রেসালত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০-৬২)

সুধী পাঠকবর্গ! এমন এক যুগ ছিল যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বৌদি (ভাবি) দস্তরখানার উচ্ছিষ্ট খাদ্য তাঁর জন্য পাঠাতেন, কিন্তু সেই ঐশী সুসংবাদ অনুসারে আজ হাজার হাজার পরিবার তাঁর দস্তরখানা থেকে প্রতিপালিত হচ্ছে। তিনি (আ.) স্বয়ং এই দুই যুগের চিত্র অঙ্কন করে আরবী পঙক্তিতে বর্ণনা করেছেন-

'এমন এক যুগ ছিল যখন অপরের দস্তরখানার উচ্ছিষ্ট খাদ্যই ছিল আমার আহার। কিন্তু আজ বহু পরিবার আমার দস্তরখানা থেকে প্রতিপালিত হচ্ছে। এছাড়া এমন এক যুগ ছিল যখন তাঁর কাছে অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য অর্থ ছিল না। হুযুর (আ.) তাঁর শ্বশুর শ্রদ্ধেয় নাসে নওয়াব সাহেবকে বলেন, 'আমার স্ত্রীর কোনও একটা গয়না বিক্রি করে অতিথিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। আজ কাদিয়ানের মত পৃথিবীর বহু দেশে জলসা সালানা আয়োজিত হচ্ছে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রবর্তিত লঙ্গর-এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সব প্রত্যেকটি জলসায় কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশনার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজে অমৃতসরে যেতেন আর এর খরচের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত থাকতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে আজ এমনভাবে আর্থিক সাহায্য ও সমর্থন লাভ হচ্ছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মিশনের পূর্ণতার জন্য জামাত বাৎসরিক শত শত কোটি টাকা ব্যয় করছে। বিশ্বের একাধিক দেশে জামাতের প্রেস (ছাপাখানা) স্থাপিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ সংখ্যক বই-পুস্তক প্রতি বছর প্রকাশিত হচ্ছে। এম.টি.এ ইন্ট্যারন্যাশনাল নামে জামাতের নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল ও একাধিক রেডিও স্টেশন রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে জামাতের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

সুধী পাঠকবর্গ! জামাত আহমদীয়ার নিত্যদিনের উন্নতি দেখে বিরুদ্ধবাদীদের অস্থিরতা কল্পনা করা কঠিন কাজ নয়। জামাত আহমদীয়ার বাৎসরিক বাজেট এখন লক্ষ ছাড়িয়ে কোটিতে এবং কোটি ছাড়িয়ে শত শত কোটিতে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এমনভাবে আর্থিক সাহায্য ও সমর্থন লাভ হচ্ছে যে, জামাত এখন বাৎসরিক শত শত টাকা ব্যয় করছে। বিশ্ব আজ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যে, ছোট্ট ও নিঃস্ব একটি জামাতের কাছে এত টাকা কোথা থেকে আসে? বস্তুবাদী চিন্তাধারার মানুষেরা যখন কিছু বুঝে উঠতে পারে না, তখন তারা বলে দেয়, এরা ইজরাইলের কাছ থেকে টাকা পায়, অমুক দেশে এদের সাহায্য করে। এমনই একটি উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহে.) বলেছিলেন-'আমেরিকা কিম্বা কানাডার ডলার নয়, কিম্বা ইউরোপিয়ান মুদ্রা বা ব্রিটিশ পাউন্ড আমাদের সম্পদ নয়। আমাদের সম্পদ সেই সব নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় যা আলোকিত বক্ষে স্পন্দিত হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে এই সব হৃদয়গুলি রয়েছে এবং যতদিন সেই সব হৃদয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, টাকার কথা কে-ই বা ভাবছে? প্রয়োজন হলে আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে বর্ষণ করবেন।"

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ২১ শে নভেম্বর, ১৯৭৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) আর্থিক সাহায্য সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার উল্লেখ করে বলেন-

"আমাদের জামা'ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জামা'ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার রীতি হলো, প্রথম দিকে এমন মানুষই তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের দেখে মানুষ বলে যে,

وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ
اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ (سورہ ہود:28)

(সূরা হুদ: ২৮)

আর এর পিছনে তাঁর প্রজ্ঞা হলো, কোনো ব্যক্তি যেন একথা বলতে না পারে, এই জামা'ত আমার সাহায্যের উপর ভিত্তি করে প্রসার লাভ করছে; বা কোনো নির্বোধ বিরোধীও যেন এই ধরনের কোনো দাবী করতে না পারে। সুতরাং, এমন জামা'তের দ্বারা এতবড় বোঝা উঠানো ঐশী সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। এই দরিদ্র জামা'ত সেভাবে সরকারি কর দিয়ে থাকে যেভাবে অন্যরা দিয়ে থাকে। ভূমিকর দেয়, সড়ক ও চিকিৎসা কেন্দ্রের খরচে অংশ নিয়ে থাকে। বস্তুত, অন্যদের যে-খরচ দিতে হয় তারাও তা দিয়ে থাকে। আবার ধর্মপ্রচার ও ধর্মের দৃঢ়তার জন্যও অর্থ দিয়ে থাকে; একাধারে গত পয়ত্রিশ বছর যাবত এই বোঝা বহন করে চলেছে। নিঃসন্দেহে এ যুগে অনেক সচ্ছল ও সম্মানিত মানুষ এই জামা'তভুক্ত হয়েছেন; কিন্তু খরচও সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, একথা কি আশ্চর্যজনক নয় যে, পৃথিবীর অবশিষ্ট মানুষ তাদের [এই জামা'তের] তুলনায় বেশি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত অসচ্ছলতারই অভিযোগ করতে থাকে। এই জামা'তের সদস্যরা প্রত্যেক বছর আল্লাহ্‌র পথে লক্ষ লক্ষ রুপী খরচ করে চলেছে; আর কোনো একটি বছরও এই খরচের আওতার বাইরে থাকে না। আর যদি বলা হয় যে, নিজেদের সকল সম্পদ খোদার পথে উৎসর্গ কর, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাও করার জন্য প্রস্তুত। এ বৈশিষ্ট্য কীভাবে সৃষ্টি হলো? নিশ্চয় 'আলাইসাল্লাহু বি কাফিন আব্দাহু -এর অবতরণকারী (আল্লাহ্) মানব হৃদয়ে এই পরিবর্তন সৃষ্টি করেছেন। নতুবা যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.) সামান্য অর্থের জন্যও চিন্তিত ছিলেন, তখন এমন কোন শক্তি ছিল, যে ক্রমবর্ধমান খরচ বা ব্যয় সঙ্কুলানের প্রতিশ্রুতি দেয়! আবার তা পূর্ণ করেও দেখায়।"

(দাওয়াতুল আমীর, পৃ: ৩৪৫)

সুধী পাঠকবর্গ! মানুষ হওয়ার দরুন আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের জীবনও সীমিত হয়ে থাকে। এই কারণেই আদিকাল থেকেই আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত রীতি এটাই যে, তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ তথা নবীগণের আগমণের উদ্দেশ্য সব সময় তাদের পশ্চাতে খলীফা ও তাদের অনুসারীদের হাতে পূর্ণতা পায়। হুযুর (আ.) -এর আবির্ভাবের লক্ষ্যকে পূর্ণতা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি বিশ্বজনীন হওয়ার পাশাপাশি এর ব্যাপ্তি ছিল কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত, তাই এই কাজ খলীফাদের হাতেই পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন ধারাবাহিকভাবে হুযুর (আ.)কে তাঁর মৃত্যু আসন্ন হওয়ার সংবাদ দেওয়া হল, তখন তিনি (আ.) তাঁর রচনা 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় জামাতকে আশ্বস্ত করে লেখেন-

"কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। ..... 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো' (অনুবাদক)।

সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৫)

হুযুর (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ১৯০৮ সালের ২৭ শে মে তাঁর মৃত্যু পর হযরত মৌলানা হাকীম নুরুদ্দীন (রা.) জামাতের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন আর ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই আযিমুশ শান খিলাফতের ধারা সূচিত হয় যার প্রতিশ্রুতি ছিল কুরআন করীম এবং হাদীসে। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফার নেতৃত্বে জামাত আহমদীয়া উন্নতির নতুন নতুন গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

খিলাফতে খামিসার কল্যাণময় যুগে অসাধারণ তবলীগী প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করারও এখানে অত্যন্ত জরুরী।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর পৃথিবীতে শান্তি প্রসঙ্গে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এক অভিযান শুরু করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে জামাত আহমদীয়া মুসলেমার ন্যাশনাল চ্যাপ্টার এমন প্রয়াস জারি রেখেছে যার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচার হচ্ছে। আহমদী মুসলমানরা মুসলিম এবং অমুসলিম বিশ্বে শান্তির বাণী সংবলিত কোটি কোটি ইশতেহার বিতরণের কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

আন্তঃধর্মীয় সমন্বয় এবং শান্তি সম্মেলন আয়োজন করছে এবং কুরআন করীমের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে যাতে কুরআন করীমের পবিত্র বাণী জগতের কাছে পৌঁছতে পারে। এই সৎ প্রচেষ্টা সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে প্রশংসা অর্জন করছে। আর একথা প্রমাণ হচ্ছে যে, ইসলাম শান্তি, দেশপ্রেম এবং মানবতার সেবার ধ্বজাবাহক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০০৪ সালের বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করেন যেখানে শান্তি, সৌহার্দপূর্ণ চিন্তাধারার প্রসারের জন্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষ যোগদান করে। এই সম্মেলনে প্রতি বছর মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনীতিক, ধর্মগুরু এবং অন্যান্য বিশিষ্টবর্গ অংশগ্রহণ করে থাকেন।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জগতকে অবগত করার জন্য বিভিন্ন দেশের সংসদ এবং শান্তি সম্মেলনে ভাষণ দান করেন। তাঁর ভাষণগুলি এতটাই প্রভাবশালী হয়ে থাকে যে, অমুসলিম রাজনীতিক এবং ধর্মগুরুরা এর সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারে না। এই প্রেক্ষিতে তিনি যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট, সেনা হেডকোয়ার্টার (জার্মানী), যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিল (ওয়াশিংটন), ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট (ব্রাসেলস, বেলজিয়াম), হামবার্গ জার্মানী, ওয়েলিংটনে নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দান করেছেন।

অনুরূপভাবে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) পৃথিবীর বড় বড় রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতাদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা বর্ণনা করে পৃথিবীতে বিরাজমান অশান্তি দূর করার এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ষোড়শ পোপ বেনডিক্ট, ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী, ইসলামিক গণতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, কানাডার প্রধানমন্ত্রী, হেরমেন শরীফের খাদিম তথা সৌদি আরবের বাদশাহ, প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, জার্মানীর চান্সেলর, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি, ব্রিটেনের রানী, ইরানের নেতা এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের নেতার নামে পত্র লেখেন।

এছাড়াও সম্প্রতি ২০২২ সালের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার একবছরের মধ্যে জামাত যে উন্নতির চিত্র তুলে ধরেছেন তা সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এবং আহমদীয়া খিলাফতের জলজ্যন্ত প্রমাণ। এটা এ বিষয়েরও প্রমাণ যে, সৈয়্যদানা ও মৌলানা হযরত মহম্মদ (সা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমণ এবং তাঁর বিজয় সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাও সত্য ছিল।

হুযুর আকদস এক বছরের উন্নতির চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, আল্লাহ তা'লার কৃপায় এবছর পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ৩৫৫টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও আরও ৮৫৫টি নতুন স্থানে প্রথমবার জামাতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে।৪০টি নতুন জামাত স্থাপন করে কঙ্গো কনশাসা এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এরপর তানজানিয়া দ্বিতীয় এবং সিরালিওন তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এবছর জামাত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০৯টি মসজিদ হাতে পেয়েছে যার মধ্যে নতুন ১৪৭টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে আর ৬২ টি আগে থেকে তৈরী হওয়া মসজিদ লাভ হয়েছে। এবছর আফ্রিকার ঘানায় ২০টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে যার ফলে সেখানে মোট মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৬২টি। সিরালিওনে মসজিদের মোট সংখ্যা ১৫৫৬ আর নাইজেরিয়ায় ১৪০০ এবং বেলিজ-এ প্রথম নির্মিত নুর মসজিদের উদ্বোধন হল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর ১২৩টি নতুন মিশন হাউস যুক্ত হয়েছে। মিশন হাউস, তবলীগি সেন্টার স্থাপনার নিরিখে সিরালিওন ও তানজানিয়া তালিকার শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে বেনিন এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে ঘানা। এ বছর কুরআন করীমের স্পেনিশ অনুবাদ ছাপা হয়েছে। অনুরূপভাবে নতুন 'মঞ্জুর' ফন্টে হযরত মৌলবী শের আলি সাহেব (রা.) -এর ইংরেজি অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পাঁচটি রচনার ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। এছাড়াও মালফুযাত দশম খণ্ড এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর রচনা 'রদ্দে তানাসুখ'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। আরবী ডেস্ক এবছর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ১২টি বই আরবী অনুবাদসহ চূড়ান্ত করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রূহানী খাযায়েন-এর ৮৮টি বই-এর মধ্য থেকে ৭৮টি বইয়ের হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ৭২টি বই জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এবছর ৫০৫টি বিভিন্ন বই, পামফ্লেট এবং ফোল্ডার্স ৪৬টি ভাষায় তথা ৬৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৭২ টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। যে দশটি সব থেকে বেশি পরিমাণ বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম হল জার্মানী। দ্বিতীয় হল হল্যাণ্ড এবং তৃতীয় যুক্তরাজ্য। ২২টি দেশ ৪৭টি ভাষায় এক লক্ষ ২৫ হাজার ১১০-এর অধিক পুস্তক পাঠানো হয়েছে যেগুলির মোট মূল্য ৪ লক্ষ ৩০ হাজার পাউন্ড। জামাতের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সংবলিত ৫০৭১টি লিটেরেচার এবং ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার ফোল্ডার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ৮২ লক্ষ ৯২ হাজারের বেশি মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। পৃথিবীর ১০১টি দেশে এখন পর্যন্ত ১০৬টির বেশি কেন্দ্রী ও আঞ্চলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর ফারেনহাম ছাপাখানা জামাতের অজস্র বই পুস্তক ছাপানোর তৌফিক লাভ করেছে। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২লক্ষ ২ ৯ হাজারের বেশি। এছাড়া 'আনসারুদ্দীন পত্রিকা, আন নুসরাত পত্রিকা, ওয়াকফে নও-এর পত্রিকা মরিয়ম ও ইসমাঈল, ছোট ছোট পামফ্লেট, লিফলেট এবং জামাতের দপ্তরের স্টেশনারী ছাপানোর তৌফিক লাভ হয়েছে। আফ্রিকার সাতটি দেশে স্থাপিত আহমদীয়া ছাপাখানা ৫ লক্ষ ৭১ হাজারের বেশি বই-পুস্তক প্রকাশ করেছে। এবছর ১০২টি দেশে সামগ্রিকভাবে ৭৬ লক্ষ ১১ হাজার লিফলেটস বিতরিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষের কাছে জামাতের সংবাদ পৌঁছেছে। এর মধ্যে জার্মানী প্রথম স্থানে এবং যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ৬ হাজার ৪১টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ৯ লক্ষ ২৯ হাজার মানুষের কাছে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। ১২৩৪ টি কুরআনের অনুবাদ উপহার হিসেবে বিভিন্ন অতিথিদের দেওয়া হয়েছে। ৪৮২০ বুকস্টল এবং বুক-ফেয়ার-এর মাধ্যমে ১১ লক্ষ ৩৪ হাজারের বেশি মানুষের কাছে জামাতের বাণী পৌঁছেছে।এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে জামাত এবং অঙ্গ সংগঠনগুলির অধীনে ২৪টি ভাষায় ১২০টি তালিমী, তরবীয়তি এবং তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ সংবলিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। ২৭শে ২০১৯ থেকে সপ্তাহে দুই দিন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল এবছর ৫টি বিশেষ সংখ্যা সহ মোট ১০১টি সংখ্যা প্রকাশ করার তৌফিক লাভ করেছে। এবছর এই পত্রিকা ওয়েব সাইট, টুইটার এবং ফেসবুকের মাধ্যমে ৩কোটি ৭১ লক্ষের বেশি মানুষের কাছে জামাতের বার্তা পৌঁছেছে। ইংরেজি ভাষাভাষির মানুষের জন্য প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা আল হাকাম পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিডিয়া অর্গানাইজেনশনের মর্যাদা লাভকারী রিভিউ অফ রিলিজিয়ন পত্রিকাটির ১২০ বছর পূর্ণ হয়েছে, যে পত্রিকাটির হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৯০২ সালে সূচনা করেছিলেন। পত্রিকাটি ইংরেজিতে মাসিক, জার্মানীতে দ্বি-মাসিক এবং ফ্রেঞ্চ এবং স্পেনিশ-এ ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। এবছর এই পত্রিকাটি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ এবং জার্মান ভাষায় ২ লক্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল ফযল অন-লাইন-এর ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ফেসবুক স্টেটাস এবং পিডিএফ.এর মাধ্যমে এর পাঠক সংখ্যা ৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এবছর ২৯১ টি সংবাদ এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করার তৌফিক লাভ হয়েছে যার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে ৩ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে জামাতের বার্তা পৌঁছেছে। কুরআন করীম অনুসন্ধানের নতুন ওয়েব সাইট

OpenQuran.com কে আরও উন্নত করা হয়েছে। আল ইসলাম-ওয়েব সাইটে কুরআন পাঠ এবং শোনর জন্য আরও বেশি আকর্ষনীয় ReadQuran.app এ্যাপ-এর প্রথম মোবাইল সংস্করণের প্রবর্তন হয়েছে। ইংরেজি ভাষা ৩৩০টি এবং উর্দু ভাষায় এক হাজার বই ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজিতে ৬টি নতুন বই অ্যাপেল, গুগল এবং আমাজনে পাবলিশ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯১টি বই এই প্লাটফর্মে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু এবং ইংরেজিতে ১৭টি নতুন অডিও বুক প্রস্তুত করা হয়েছে। এরফলে এযাবৎ উর্দুতে ৮২টি এবং ইংরেজিতে ৫১টি অডিও ফাইলস তৈরী হয়েছে। ২০টি ভাষায় হুযুর আনোয়ারের খুতবা জুমআর অডিও এবং ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমানে সারা বিশ্বে ওয়াকফীনে নওদের সংখ্যা ৭৮ হাজার, যার মধ্যে ৪৫ হাজার ৮৩২ জন ছেলে এবং ৩২ হাজার ১৬৮জন মেয়ে। এবছর যে সব নতুন আবেদন পত্রে পিতামাতাকে প্রাথমিকভাবে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সংখ্যা ৩৫১৯টি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনালের ১৬টি বিভাগ, ৫০৩জন কর্মী রয়েছে। যাদের মধ্যে ৮০জনকে বেতন ভাতা দেওয়া হয়। এম.টি.এ আফ্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন আফ্রিকান দেশে ১২টি স্টুডিও ও রেডিও স্থাপিত আছে যেখানে ১৫০ জন কর্মী কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন্য এম.টি.এ ৮টি চ্যানল ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার করছে এবং ২৩টি বিভিন্ন ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা হচ্ছে। কেনিয়া, রাওয়ান্ডা এবং মাউট আইল্যান্ডে তিনটি নতুন স্টুডিও তৈরী হয়েছে। ক্যামেরুন-এ কেবল সিস্টেমেও এম.টি.এ দেখানো হয়। বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২৫টি জামাতের রেডিও স্টেশনের মধ্যে মালিতে ১৫টি, বুর্কিনাফাসোয় ৪টি এবং সিরালিওন-এ ৩টি এবং তানজানিয়া, গ্যাম্বিয়া এবং কঙ্গো কানশাসা একটি করে রেডিও স্টেশন রয়েছে।

ভয়েস অফ ইসলাম রেডিও লন্ডনের বাইরে প্রসার লাভ করেছে। ২৪ঘন্টার সম্প্রচার ছাড়া অন্যান্য টিভি প্রোগ্রাম ৭৪টি দেশে টিভি, রেডিও চ্যানেল জামাতের বাণী প্রচার করছে।এবছর ২৬৮৬টি টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৪৭৬২ ঘন্টার মোট ১৭২০৪টি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে এর মাধ্যমে ৩৪ কোটির বেশি মানুষের কাছে জামাতের বাণী পৌঁছেছে।

আফ্রিকার ১২টি দেশে ৩৭টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক কাজ করছে। ৪৮জন কেন্দ্রীয় এবং ৩৪জন স্থানীয় ডাক্তার সেখনে সেবারত রয়েছেন। এছাড়াও লাইবেরিয়ায় ডেন্টাল ক্লিনিকের সূচনা হয়েছে। আফ্রিকার ১১টি দেশে ৬১৫টি প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এবং ১০টি দেশে ৮০টি মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা দান করছে। নাইজেরিয়ায় প্রথম আহমদীয়া ক্লিনিকের সূচনা হয়েছে।

হযরত আকদস আমীরুল মোমেনীন-এর দ্বারা উপস্থাপিত জামাতের উন্নতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হল। যা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি ক্ষেত্রে জামাতকে উন্নতি দান করেছেন। জামাতের জনবল বৃদ্ধি পাচ্ছে আর সম্পদও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবশেষে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি ঈমান উদ্দীপক উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে জামাতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে লেখেন-

"খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদের সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দেবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হতে অপসারিত করে দেবেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।"

..... খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব।এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।অতএব হে শ্রোতৃবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রেখো! এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন-আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করে রাখ। এটি খোদার বাণী। একদিন তা পূর্ণ হবেই হবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খন্ড- ২০, পৃ: ৪০৯)

বিক্রয় হয় না এবং পৃথকভাবে বিক্রয় হয় সেগুলোর কথা এখানে উল্লেখ নেই। অতএব যেসব পণ্য বাজারে এনে বিক্রয় করা হয় সেগুলোর সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হলো একটি মূল্য নির্ধারিত থাকা উচিত যেন কোনো দোকানদার মূল্য কম বেশি করতে না পারে। অধিকন্তু ফিকাহবিদরা কতক আসার ও হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যা এর সমর্থন করে। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩০৭-৩০৮)

অন্যথায় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মানুষ একে অন্যের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে থাকে, তাই একটি মূল্য ধার্য্য হওয়া উচিত। পঞ্চম হিজরীতে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নাকী নামক স্থান অতিক্রম করার সময় সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও ঘাস দেখতে পান আর অনেক কুয়াও দেখেন। তাই তিনি (সা.) সেসব কূপের পানির (গভীরতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা যখন এসব কূপের প্রসংশা করি তখন এগুলোর পানির স্তর নেমে যায় আর কূপগুলো শুকিয়ে যায়। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতা (রা.)কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন একটি কূপ খনন করেন। তিনি (সা.) নাকীকে চারণভূমি বানানোর নির্দেশ দেন। হযরত বেলাল বিন হারেস মুযনী (রা.)কে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত বেলাল (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আমি এই জমির কতটা চারণভূমি বানাব? মহনবী (সা.) বলেন, সূর্যোদয়ের সময় বজ্রকণ্ঠের অধিকারী এক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দাও। [রাতের অন্ধকারে যেহেতু অনেক দূর পর্যন্ত আওয়াজ শোনা যায়, তাই দিনের বেলায়, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরএক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দাও] আর মুকাম্মাল পাহাড়ে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দাও, তার আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায় ততদূর পর্যন্ত অংশকে মুসলমানদের (সেসব) ঘোড়া এবং উটের জন্য চারণভূমি বানিয়ে দাও যার সাহায্যে তারা যুদ্ধ করতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যেসব ঘোড়া ও উট রয়েছে সেগুলো যেন সেখানে চরে। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মুসলমানদের চরে বেড়ানো পশুগুলো সম্পর্কে আপনার কী নির্দেশ? [অর্থাৎ মুসলমানদের অন্য যেসব গবাদি পশু রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে (আপনার সিদ্ধান্ত কী)]। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলো এখানে প্রবেশ করবে না। [অর্থাৎ জিহাদ বা যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত পশুগুলোই এখানে চরতে পারবে। অন্যান্য গবাদি পশু নিজ নিজ চারণভূমিতে যাবে।] তখন হযরত বেলাল (রা.) আবারও নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সেই দুর্বল পুরুষ বা মহিলাদের সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কী যাদের কাছে অল্প সংখ্যক ছাগল বা ভেড়া রয়েছে আর তারা সেগুলো অন্যত্র নেয়ার সামর্থ্য রাখে না? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, সেগুলোকে ছেড়ে দাও এবং চরতে দাও। [দরিদ্রদের যে অল্প সংখ্যক গবাদি পশু রয়েছে সেগুলোকে চরতে দাও।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫২-৩৫৩)

একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, একজন আনসারী হাররার সেই নদী নিয়ে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল যা থেকে মানুষ খেজুর বাগানে সেচ দিত। আনসারী(সাহাবী) হযরত যুবায়ের (রা.)কে বলেন, পানি প্রবাহিত হতে দিন কিন্তু তিনি তা না মানেন নি। ফলে তারা উভয়েই মহানবী (সা.)-এর কাছে নালিশ নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)কে বলেন, হেযুবায়ের! তুমি তোমার গাছগুলোতে সেচ দেওয়ার পর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী (সাহাবী) মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, আপনার মিমাংসা এভাবে করার কারণ সে আপনার ফুফুর ছেলে। একথা শুনেমহানবী (সা.)-এর চেহারার রঙ বদলে যায় আর তিনি (সা.) বলেন, হে যুবায়ের! নিজের গাছগুলোকে পানি দেওয়ার পর পানি আটকে রাখো যতক্ষণ না আইল পর্যন্ত পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি মনে করি "তোমার প্রতিপালকের কসম! কোনোক্রমেই তারা মু'মিন হতে পারবে নাযতক্ষণ না তারা তোমাকে সেসব বিষয়ের মিমাংসাকারী মানবে যা তাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে"- এ আয়াততখনই অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি বুখারী শরীফের রেওয়াত।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাসাকাত ওয়াস সিয়ার, হাদীস-২৩৫৯-২৩৬০)

এ হাদীসে যে আনসারী (সাহাবীর) উল্লেখ রয়েছে তার সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরগ্রন্থে লিখা রয়েছে, এতে মতবিরোধ রয়েছে। তফসীর কুরতবীতে মাক্কী ও নুহাসের ভাষ্যমতে লিখিত রয়েছে, সেই আনসারী সাহাবী ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতা (রা.)।

(আল জামিউল লি আহকামিল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪১)

আজ এ পর্যন্তই আমার বর্ণনা করার ছিল। অল্প কিছু (বর্ণনা) রয়ে গিয়েছে, সেগুলো ভবিষ্যতে কখনো বর্ণনা করব। ইনশাআল্লাহ্ ।

কবুলীয়্যতে দোয়া এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা-র আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী।

-মুনীরআহমদ খাদিম,নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, জুনুবী হিন্দ।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও সম্মানীয় শ্রোতৃবৃন্দ! আপনারা শুনেছেন যে আমার বক্তৃতার বিষয় হল আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও দোয়া গ্রহণীয়তার আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী। সুধী শ্রোতাবৃন্দ। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও আস্থা রাখা এবং তার সামনে দোয়ার জন্য মাথানত করা প্রকৃতপক্ষে উভয় গুণাবলী একে অপরের পরিপূরক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে সে জগতের অন্যান্য অস্তিত্ব ও স্থানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। যাকে পূর্ণ অনুরক্ত বলে। এবং শুধুমাত্র তাঁর হাত খোদা তা'লার দিকে উত্তোলিত হয়। তাই পবিত্র কুরআনে এই ধরণের বিশ্বাসীদের এবং তাদের দোয়ার কথা উল্লেখ করার সময় মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- 'তারা শত্রুদের চক্রান্ত হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে এই দোয়া করে ,,,,,,,' ,,,,,, যার অর্থ হল হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর ভরসা করি এবং তোমার সামনে নতজানু হই। এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (সুরাতুল মুমতাহিনা, আয়াত: ৫) ,,,,,,,,,,,, যার অর্থ,'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি জ্ঞানের বিষয়ে সমস্ত বস্তু হতে উর্ধ্বে। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি। হে আমাদের প্রভু! আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যের মীমাংসা করো।

খাকসার নিজের বক্তৃতা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর একটি দোয়ার মাধ্যমে শুরু করতে চাই। যা থেকে বোঝা যায় যে, আঁ হযরত (সা.) দোয়ার প্রতি কতটা একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলে করীম (সা.) দোয়া চাইতেন- ' হে আল্লাহ্! আমি তোমার আনুগত্য করি। তোমার উপর ভরসা করি। তোমাকে বিশ্বাস করি। তেমার কাছে মাথা নত করি। হে আমার আল্লাহ্ আমি তোমার বুজুর্গের নীচে আশ্রয় নিতে চাই। তুমি ছাড় কোনও উপাস্য নেই। তুমি আমাকে পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা কর। তুমি জীবিত তুমি ছাড়া কারো পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। মানুষ ও জিন সকলের জন্য পরিণাম অনিবার্য। (মুসলিম, কিতাবয যিকর)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আস্থা ও দোয়ার বিষয়ে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন- 'যে ব্যক্তি খোদার প্রতি পূর্ণ অনুরক্ত হবে সে আস্থাবান হবে। তাই আস্থাবান হওয়ার জন্য অনুরক্ত হওয়া শর্ত। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের সাথে এইরকম সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ তার উপর ভরসা এবং আস্থাবান হয়। সেই সময় পর্যন্ত খোদার উপর ভরসা তখন হয়। যখন সে খোদার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আবার সে জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। যা অন্য কোন গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের নেতাদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই এবং তাদের বিরোধিতার কোনরকম আঁচ পড়ে না। তিনি (সা.) মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অসামান্য বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এই কারণেই তিনি (সা.) জাগতিক বড় বড় দয়িত্বভার নিজের স্কন্ধে অর্পন করেছিলেন এবং সমস্ত জগতের বিরোধিতা সত্ত্বেও তার অস্তিত্বে কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। যার বড় দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাবান হওয়া এবং যার উপমা জগতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই কারণেই আল্লাহকে প্রিয় করে জগতকে বিরোধি করে নিয়েছিলেন। এই অবস্থার উদ্ভব তখনই হয় যখন সে কিনা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পায়। সেই সময় পর্যন্ত এই ভরসা বা আস্থা থকতে হবে। তার পরেই দ্বিতীয় দরজা খুলবে। যখন সে আশা-ভরসা এবং বিশ্বাস হয়ে যায় তখন সে প্রিয়দেরকে খোদার পথে শত্রু মনে করে। সেই জন্যই তিনি জানেন যে খোদা তা'লা অন্যদেরকে তার বন্ধু বানিয়ে দেবেন। সে স্থাবর-অস্থাবর হারিয়ে ফেলে, এর থেকেও উত্তম কিছু পাওয়া যাবে, এমন বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল থাকে। এই কথার সারমর্ম হল যে, 'খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া ও খোদায় পূর্ণ অনুরক্ত বা বিলীন হয়ে যাওয়া। তাই খোদায় অনুরক্ত ও আস্থা হল পরস্পরের পরিপূরক। পূর্ণ অনুরক্তের গুঢ় অর্থ হলো আস্থা বা ভরসা। আর আস্থার শর্ত হল অনুরাগ ও ভালবাসা। এই নিয়মে এটাই আমাদের ধর্ম।

(মালফুযাত, পৃ: ৫৫৪-৫৫৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কতই না অনন্য ছিলেন এবং মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কতটা বিশ্বাসী ছিলেন। হযরত চৌধুরী হাকিম আলী সাহেব নম্বরদার (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, যখন আমাদের উপর কোনও কষ্ট আসে অর্থাৎ যখন কোন শত্রু মামলা দায়ের করে বা অনুরূপ কিছু একটা ঘটে তখন মনে হয় আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঘরে এসেছেন।(সীরাতুল মাহদী, লেখক- সীরাতুল মাহদী, লেখক-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাবেহ (রা.), দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ অংশ,রেওয়ায়েত নম্বর-১১৬৯)

যখন কোন বিরোধীর সাথে ধর্মীয় বিতর্ক হত তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার উপর ভরসা করতেন। সুতরাং হযরত মুনশী জাফর সাহেব কপুরথলবী (রা.) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ আথম একবার এমন এক প্রশ্ন করেছিলেন যে আমাদের কিছু লোক ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে এগুলির উত্তর অবিলম্বে দেওয়া যাবে না। এবং কিছু লোক একটি কমিটি নিযুক্ত করে পবিত্র কুরআন ও বাইবেলের প্রমাণের মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। হযরত মুনশী সাহেব বলেন, আমি আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেবের সাথে ঠাট্টা করে বলেছিলাম যে নবুয়্যত কি পরামর্শের মাধ্যমে হয়। ততক্ষণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রবেশ করলেন এবং কিছ কথা বলে চলে গেলেন। সুতরাং মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা যদি আগামীকালের উত্তরের জন্য পরামর্শ করি তাহলে কোনও অসুবিধা নেই। এতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হেসে বললেন, আপনার দোয়াই যথেষট বলে সাথে সাথে চলে গেলেন। এই বর্ণনা সেই সমস্ত লোকদের উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যারা বলে, মির্যা সাহেব উলেমাদের লুকিয়ে রেখেছেন যারা তাকে বই লিখতে সাহায্য করে।

(সীরাতুল মাহদী, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ)

আল্লাহ্ তা'লার উপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অগাধ আস্থা ছিল। তিনি ছাড়া অন্য কারো উপর তিনি বিন্দু মাত্র ভরসা করাকে কুফরী বলে মনে করতেন। হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'হযত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাথাব্যাথার অসুখ ছিল। একজন ডাক্তারের কথা শোনা গেল যে এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রাখত। তাকে ভাড়া দিয়ে পাঠানো হল এবং কিছুদূর থেকে তিনি বললেন, দুদিনের মধ্যে আপনাকে সুস্থ করে দিব। এই কথা শুনে হযরত মৌলবী সাহেব ভিতরে চলে গেলেন এবং হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন (রা.) সাহেবের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখলেন যে, আমি এই ব্যক্তির কাছে চিকিৎসা করাতে চাই না। সে কি নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছে। তাকে তার টাকা ফেরত দাও এবং আরও কুড়ি পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দাও। এটা দিয়ে তাকে ছুটি দিয়ে দাও। সুতরাং এমনটাই করা হল।

(সীরাতুল মাহদী, লেখক-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব রেওয়ায়েত নম্বর-১০৩৮)

এখন খাকসার দোয়ার গ্রহণীয়তা সম্পর্কে সীরাতুল মাহদী থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করব। শ্রদ্ধেয় মুফতী মোহাম্মদ সাদেক (রা.) আমাকে বলেছেন, স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেব যখন এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন যে দোয়া শুধুমাত্র একটি ইবাদত। অন্যথায় এর কারণে খোদা তা'লা তার ভাগ্য বা নিয়তিকে পরিবর্তন করেন না। তা যাই হোক না কেন, সে তার নিজের পথে চলে। আর এর উপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বরকাতুদ দোয়া নামে একটি পুস্তিকা লেখেন এবং প্রকাশ করেন। তাতে তিনি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেন যে, দোয়া কেবল ইবাদতই নয় বরং এর ফলে খোদা তা'লা নিয়তিকেও পরিবর্তন করে দেন। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান এবং ভাগ্য বিধাতা। ইসলামী শিক্ষার অধীনে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সাহেবের বিশ্বাস সঠিক নয়। এই পুস্তকটি গোপনে প্রস্তুত করা হলে এর একটি কটি আহমদ খান সাহেব এর কাছে পাঠানো হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সাহেবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে একটি চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠিতে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে লিখেছিলেন যে, 'আমি এই মাঠের মানুষ নই। সেই কারণেই আমার ভুল হয়েছে এবং আপনি যা কিছু লিখেছেন তাই সঠিক হবে।

(সীরাতুল মাহদী, লেখক হযরত বশীর আহমদ সাহেব, রেওয়ায়েত নম্বর- ৮৩০)।

এখন খাকসার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দোয়া গ্রহণীয়তার অসাধারণ অলৌকিক নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করব। সুধী শ্রোতৃবৃন্দ! খ্রিষ্টানগন হযরত মসীহ নাসরি (আ.) কে এমন কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খোদা তা'লার আসনে বসিয়েছেন যে তারা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থ করে দিতেন। পঙ্গুদের সুস্থ করতেন। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের দৃষ্টিশক্তি দান করতেন। মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করে তুলতেন। যদিও এই অর্থ আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ ব্যক্তিদের দৃষ্টি দান করা এবং আধ্যাত্মিকবাবে মৃত ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক জীবন দান করা। এ ব্যাপারে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কিয়ামত দিবসে আমিই হব সর্বপ্রথম 'শাফায়াত' দানকারী আর সর্বপ্রথম আমার 'শাফায়াত' গৃহীত হবে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

কোন সন্দেহ নেই যে তিনি এমন কিছু রোগীকেও সুস্থ করেছেন যাদের বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি ছিল না এবং তারা এমমন রোগী ছিলা যে মৃত হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে খিষ্টানরা তাকে অর্থাৎ ঈসা (আ.)কে খোদার আসনে বসাল। এইরকম চিকিৎসা এবং এইরকম জীবনের উদাহরণ দেখতে পাই। তার চেয়েও বড় কথা মসীহ মওউদ (আ.) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর বরকতময় জীবনে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এমন সব রোগীদের আরোগ্য দান করেন যাদেরকে ডাক্তার বলেছিলেন যে অসুখ সারানো যাবে না, মৃতপ্রায় বা মুমূর্ষ রোগী হয়ে গেছে।

হযরত মৌলবী মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব বাকাপুরী (রা.)- বর্ণনা করেন যে, একবার আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সমীপে দন্ডায়মান হয়ে বললাম যে আমার চোখ থেকে জল ঝরছে। আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি (আ.) বললেন, অবশ্যই দোয়া করব। তিনি বললেন, আপনাদের মৌলবী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) -এর কাছ থেকে ইতরাফিল যামানী নামক একপ্রকার ফল নিয়ে খান। আল হামদোলিল্লাহ। এর পর থেকে খাকসারের আর কোনদিন এই অসুখ হয় নি।

(সীরাতুল মাহদী, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, রেওয়াতে নম্বর-৮১৭)

হযরত মুন্সী আব্দুল আযীয সাহেব আওজলবী (রা.) বর্ণনা করেন যে, সানু সাকিন শেখাওয়া নামে এক ব্যক্তি আমার সাথেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাছে বয়আত করেছিলেন। এখন তিনি বেহেশতি মাকবারাতে সমাহিত আছেন। তার চোখ থেকে পানি ঝরার অসুখ ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) কে তিনি চোখ দেখিয়েছিলেন। তিনি (রা.) বললেন, প্রথমে চোখে পানি আসবে তারপর দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে। এরপর তার চিকিৎসা করা হবে। এতে তিনি খুব মর্মাহত হন। অতঃপর তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন যে, যখনই তিনি কাদিয়ানে আসতেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পাশে বসার সুযোগ পেতেন, তখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পাগড়ির নিচের অংশ নিয়ে নিজের চোখে বুলিয়ে নিতেন। কিছু সময়ের মধ্যে তার চোখ থেকে পানি ঝরা কমতে থাকে। এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তার চোখ ভাল ছিল। কোনরকম চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নি।

(সীরাতুল মাহদী, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. রেওয়াতে নম্বর-৫৬৮)

এখন আর একটি দোয়া গ্রহণীয়তার ঈমান বর্ধক ঘটনা শুনুন। হযরত ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেব (রা.) বলেন, তিনি একবার তিন মাসের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন এবং কাদিয়ানে সপরিবারে বসবাস করার সুযোগ পান। ঐ দিনগুলিতে এইরকম সুযোগ হয়েছিল যে ওলীউল্লাহ্ শাহ-এর মায়ের দাঁতে প্রচন্ত ব্যাথা হচ্ছিল যার কারণে তার দিনরাত ঘুম আসত না। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করা হয়েছিল কিন্তু কোনও উপকার পাওয়া যায় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) তাকে ঔষধ দিলেও আরাম পাননি। হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) হুযুরের নিকট আবেদন করলেন যে, ডাক্তার আব্দুস সাত্তার সাহেবের স্ত্রীর দাঁতে প্রচন্ড ব্যাথা রয়েছে। তিনি বিশ্রাম নিতে পারছেন না। হযরত সাহেব তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে আমাকে বললেন যে, তার কোথায় কষ্ট হচ্ছে।অতএব, তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, তার এই দাঁতে খুব ব্যাথা আছে। ডাক্তার এবং মৌলবী সাহেবের অনেক ঔষধ খেয়েছি কিন্তু কোনও উপকার হয় নি। তিনি (আ.) বললেন, আপনি একটি অপেক্ষা করুন। অতএব, হুযুর (আ.) ওজু করলেন এবং বলতে লাগলেন যে আমি আপনার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ্ তা'লা আপানাকে সুস্থ করে দিবেন। ভীত হবেন না। হুযুর (আ.) দুই রাকাত নফল নামায পড়লেন। আর সেই মহিলা বসে রইলেন। ইতিমধ্যে তিনি অনুভব করতে লাগলেন যে, যে দাঁতের মধ্যে ব্যাথা আছে সেই দাঁতের নিচে থেকে একটি আগুনের গোলার মত ধোয়াঁওয়ালা দাঁত তার মাড়ি থেকে আকাশে দিকে যাচ্ছে। এবং সাথে সাথে ব্যাথা কমতে থাকে। সুতরাং সেই গোলা আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার পর অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছু সময় পর হুযুর (আ.) সালাম ফেরালেন। এবং ব্যাথা ততক্ষণাৎ শেষ হয়ে গেল। হুযুর (আ.) জিজ্ঞেস করলেন এখন পরিস্থিতি কেমন আছে? তিনি বললেন, হুযুরের দোয়াতে সুস্থ হয়ে গেছে। এবং তিনি খুব আনন্দিত হলেন যে, খোদা তা'লা তাকে এই কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

(সীরাতুল মাহদী, রেওয়ায়েত নম্বর:৮৮৪)

হিস্টোরিয়া বা খিচুনির অসুখ হতে নিদর্শনস্বরূপ আরোগ্য লাভের ঘটনা।

হযরত সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার কন্যা জয়নব বেগম আমার কাছে একবার বর্ণনা করে যে, হুযুর (আ.) একবার সিয়ালকোটে আসেন। আমি প্রজা হিসেবে তার কাছে উপস্থিত হলাম। ঐ দিনগুলিতে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা ছিল। খিচুনির অসুখে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমি লজ্জার কারণে হুযুর (আ.) কে কিছু বলতে পারি নি। কিন্তু আমার মন চাইছিল যে কোনও প্রকারে আমার অসুখের ব্যাপারে হুযুর (আ.) কে অবগত করতে। তাহলে হুযুর (আ.) আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি হুযুর (আ.) এর সেবা করছিলাম, যাতে হুযুর (আ.) দিব্য দর্শন ও পবিত্র হৃদয়ে আমার অসুখের ব্যাপারটা জানতে পারেন। তিনি বলেন, তোমার খিচুনির অসুখ রয়েছে? আমি দোয়া করব। তুমি কিছু ব্যায়াম ও শরীর চর্চা কর। হাঁটাচলা করা। কিন্তু এক পাও চলাচল করতে পারি না। যদি দু চার পা হাঁটাচলা করি খিচুনির অসুখ ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। হুযুরের বাড়ি হতে প্রায় এক মাইল দূরে আমার বাড়িতে গেলাম। ঘোড়া গারি খোঁজ করলাম। কিন্তু পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হল। এইভাবে পায়ে হেঁটে যাওয়া আমার জন্য খুব কষ্টকর ও মৃত্যু সমতুল্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু খোদার অশেষ কৃপায় যেমন যেমন হেঁটে যাচ্ছি তেমন তেমন স্বস্তি পাচ্ছিলাম। এমনকি দ্বিতীয় দিনে যখন আমি পায়ে হেঁটে হুযুরের নিকট দেখা করতে এলাম, তখন অসুখ আস্তে আস্তে ভাল হতে থাকে এবং সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ॥ কতই না মর্যাদাবান আমার আল্লাহ্। এই মোহাম্মদী মসীহর দোয়ার অত্যাশ্চর্য ফল।

(সীরাতুল মাহদী, রেওয়ায়েত নম্বর-৯১৭)

হযরত মিঞা ফাইয আলী সাহেব কপুরথলী (রা.) এক বর্ণনায় বলেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, দোয়া গ্রহণীয়তা এবং আরোগ্য লাভের নিদর্শনাবলী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর খলীফাদের মাঝে এখনও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহমান রয়েছে। বর্ণনা করেন যে, আমার এক পুত্রের মৃগীর অসুখ হয়েছিল। অনেক চিকিৎসা করানোর পর সমস্ত জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসেন। সেই সময় হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.) -এর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই ছেলের মাকে আরো দু-একদিন অপেক্ষা করতে বললেন। আমি দোয়া করব। তাই হুজুর (আ.) সেই অসুস্থ শিশুর সুস্থতার জন্য প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ আল্লাহ্র নিকট সেজদাবনত হয়ে দোয়া করলেন। চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। রাতের বেলা অসুস্থ ছেলেটি স্বপ্ন দেখল যে পূর্ণিমার রাত এবং আমি মৃগি রোগে ভুগছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বায়তুদ দোয়া ঘরের জানালা হতে বেরিয়ে এলেন। এবং আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শারীরিক অবস্থা কেমন? আমি বললাম, হুযুর নিজেই দেখুন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় পাবে না, সুস্থ হয়ে যাবে। এরপর তার মা ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসেন। পুনরায় আমি প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং কবিরাজদের নিকট সন্তানের চিকিৎসা করাতে থাকি। অবশেষে তিনি মিরাট জেলার হাপর অঞ্চলে, একজন ডাক্তারের কাছে যান। তিনি ঔষধপত্র লিখলেন এবং রাতের বেলা সেটা নিজের সামনে খাওয়ালেন। ওই সময় ছেলেটির প্রচণ্ড খিচুনি হয়। ডাক্তার নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর আমরা দুজনে বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে গেলাম। ফজরের সময় হলো নামায পড়লাম। ডাক্তার বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাক্তারবাবু বললেন। রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম যে, আমার হাতে একটা বই দেওয়া হয়েছে। যখন আমি বইটা খুলে দেখলাম। তার প্রথমেই ছয় সাত লাইনে লেখা ছিল যে, এই অসুখের চিকিৎসা হল তেঁতুল। তেঁতুল ছাড়া এই রোগের চিকিৎসা পৃথিবীতে আর কিছু নাই। ডাক্তার বাবু বললেন এই রোগের এইবং চিকিৎসার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে আমার স্বপ্নে কথা বলে দিলাম। আমি ডাক্তারের এই স্বপ্নে কথাকে হযরত (আ.)-এর সংবাদ অনুসারে আল্লাহ্র রহমত বা আশিস বলে মনে করলাম। এবং সন্তানকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। তেঁতুলের ব্যবহার শুরু করে দিলাম। রাতের বেলা চার তলা ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা ছেঁকে নিয়ে দুই তলা মিছরির সাথে মিশিয়ে সন্তানকে পান করিয়ে দিলাম। দুই সপ্তাহের মধ্যে এই অসুখ হতে সন্তান মুক্তি পেল অর্থাৎ সুস্থ হয়ে গেল। সেই সময় খোদার ফজলে সন্তান স্নাতক বা বি.এ পাস হয় এবং খুব ভাল এক পদে সমাসীন হয়।

(সীরাতুল মাহদী, প্রণেতা; বশীর আহমদ এম.এ. রেওয়ায়েত নম্বর-৯৮১)

হযরত সৈয়্যদ ডাক্তার আব্দুসসাত্তার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর নিকট বয়আত করে চাকুরিতে ফিরে যায়। ঐ সময় কিছু দিন গোপনে থাকি। কারণ খুবই বিরোধিতা চলছিল এবং লোকেরা আমাকে খুব বিশ্বাস করত। এই কারণটির জন্য কিছু দুর্বলতা দেখায়। এমনকি আমি আমার পরিবারের কাছে একটি উল্লেখ করতে পারি নি। কিন্তু ধীরে ধীরে বিষয়টি প্রকাশ পায় এবং কিছু লোক বিরোধিতা শুরু করলেও তারা বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারে নি। বাড়ির লোকেরা বলেছেন, আপনি হয়তো বয়আত করেছেন, আপনার পীরও আছে এবং তিনি জীবিত। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিতে পারে। কারণ তার আসা যাওয়া আমাদের সাথে ছিল। আমি বললাম যে, আমি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বয়আত করেছি এবং যার হাতে বয়আতক করেছি তিনি

যুগের মসীহ ও মাহদী। তার পদমর্যাদা অন্য কেউ যে ধরণেরই সাধু হোক না কেন তার পদমর্যাদার সমতুল্য হতে পারবেন না। ফলে এই পিরের বদদোয়া বা অভিশাপ কোন রকম ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা ইন্নামাআল আমালু বিন্নিয়াত। অর্থাৎ প্রতিটি কর্মের ফল তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। আমি শুধুমাত্র খোদা তা'লাকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই কাজ করেছি। নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা কামনা বাসনার জন্য এই কাজ করি নি। কিছু সময় পরে আমার পরামর্শদাতা আমার কাছে এসেছিল এবং তিনি আমার বয়আত করার কথা শুনে আমাকে বললেন, আপনি ভাল কাজ করেন নি। মুর্শিদ যখন উপস্থিত আছেন তখন তাকে ছেড়ে এমন কেন করলেন? আপনি তার মধ্যে এমন কি অলৌকিক দেখলেন? আমি বললাম, আমি তাঁর মধ্যে এই নিদর্শন দেখলাম যে, তাঁর বয়আত করার পর খোদার ফযলে আমার আধ্যাত্মিক রোগসমূহ দূরীভূত হয়েছে। এবং আমার অন্তর প্রশান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, আমিও তাঁর পদমর্যাদা বা কেরামত দেখতে চাই। যদি তার দোয়ায় আপনার ছেলে অলিউল্লাহ্ সুস্থ হয়ে যায় তাহলে জানব যে আপনি প্রকৃত মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শনকারীর বয়আত করেছেন। এবং তাঁর দাবি যথার্থ সত্য। ওই সময় আমার সন্তান অলিউল্লাহ্ যার পায়ে আঘাত লাঘার কারণে শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং চলাফেরা করতে পারছিল না, একটি লাঠি বগলে রেখে চলাফেরা করত। আবার অনেক সময় পড়েও যেত। এরপর কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে ছে, তা সত্ত্বেও তার প্রথম ডাক্তার সিভিল সার্জান ছিলেন যিনি চিকিৎসা করছিলেন কিন্তু কোন উপকার হয় নি। হঠাৎ করে সিয়ালকোটেট হিউ গোথা নামে একজন নতুন সিভিল সার্জান আসেন। তিনি রিয়া নাম এক স্থানে একটি চিকিৎসা কেন্দ পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন। তখন আমি অলিউল্লাহ্কে তার কাছে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, চিকিৎসায় সেরে উঠতে পারে। তবে তিনবার অপারেশন করতে হবে। সুতরাং তিনি একবার সিয়ালকোটে অপারেশন করলেন দ্বিতীয়বার রিয়া চিকিৎসাকেন্দ্রে অপারেশন করলেন। যেখানে তিনি কর্মরত ছিলেন। অপরদিকে আমি হযরত সাহেবের নিকট দোয়ার জন্য আবেদন করি। খোদার কৃপায় সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং তার আর চলার জন্য লাঠির প্রয়োজন হয় না। তখন আমি ওই বুজুর্গ ব্যক্তিকে বললাম যে, দেখো খোদা তা'লার ফযলে হযরত সাহেবের দোয়ার কেমন গ্রহণযোগ্যতা! সেই ব্যক্তি বলল, এটা চিকিৎসার ফলে হয়েছে। আমি বললাম, চিকিৎসা তো ইতিপূর্বেও হয়েছিল। কিন্তু এই চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ শুধুমাত্র দোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল।

(সীরাতুল মাহদী, প্রণেতা- বশীর আহমদ সাহেব, রেওয়ায়েত নম্বর-৯২৬)

প্লেগ রোগাক্রান্ত শিশুর আরোগ্য লাভ। এই বিষয়ে বাবু ফখরুদ্দীন সাহেব বলেন, আমি একবার পিত্রাল মিয়ানীতে ছিলাম। আমার পুত্র ইসহাক যার বয়স ওই সময় দুই বছরের প্লেগ রোগের গুটি বেরিয়েছিল। ওই সময় এই প্লেগ অসুখটির খুব বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল। আমার খুব ভয় হয়েছিল এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট দোয়ার জন্য পত্র লিখলাম। শিশুটি সুস্থ হওয়ার এক মাস পর কাদিয়ান এ চলে আসি এবং শিশুটিকে হুযুর (আ.)-এর নিয়ে আসলাম এবং বললাম এটি সেই শিশু যে প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিল। হুযুর (আ.) সেই সময় শুয়ে ছিলেন। আমার কথা শোনা মাত্রই উঠে বসলেন এবং বললেন,'এই ছোট শিশুটির গুটি বেরিয়েছিল? এখন খোদা তা'লার ফযলে সেই শিশুটি যুবক এবং সুস্থ সবল রয়েছে।

(সীরাতুল মাহদী, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, রেওয়ায়েত নম্বর-১৩৪৮)

সুধি শ্রোতাবৃন্দ! এখন আমি সৈয়দানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) গৃহীত দোয়ার এমন এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব যার উদাহরণ আজ পর্যন্ত জগতে কোথাও দেখা যায় নি। এমন কি কেউ কখনও দেখেছে যে, কাউকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে এবং যার উপর জলাতঙ্কের লক্ষণ দেখা দিয়েছে এবং সে সুস্থ হয়ে উঠেছে? কিন্তু মোহাম্মদী মসীহর দোয়ার নিদর্শন দেখুন, এই ধরণের রোগীও সুস্থ হয়ে গেছে। যদিও এই বর্ণনাটি সিরাতুল মাহদী পুস্তকের রেওয়ায়েত নম্বর ১২২১ এর অন্তর্গত হযরত মীর আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) (বারামোল রেঞ্জ অফিসার, কাশ্মীর)-এর প্রমাণাদিতে উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু দোয়ার গ্রহণীয়তার এই অনন্য ও অতুলনীয় ঘটনাটিকে আমি হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় বর্ণনা করা সমীচীন মনে করি।হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

' আব্দুল করীম পিতা আব্দুর রহমান নামে হায়দারাবাদ দক্ষিণের জনৈক ছাত্র আমাদের মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে পাগল কুকুরে কামড়ে দেয়। আমরা তাকে চিকিৎসার জন্য কাসোলী পাঠিয়ে দিই। কয়েকদিন পর্যন্ত কাসোলীতে তার চিকিৎসা হতে থাকে। এরপর কাদিয়ান ফিরে আসে। কিছু দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেল যা পাগল কুকুরে কামড়ালে হয়। সে পানিকে ভয় পেতে শুরু করল আর ভয়ানক অবস্থা তৈরী হল। তখন প্রবাসে থাকা সেই অসহায় ছেলেটির জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠল আর দোয়ার জন্য বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হল। সকলে মনে করল বেচারা হয়তো কয়েক ঘন্টাতেই মারা যাবে। নিরুপায় হয়ে বোর্ডিং থেকে বের করে সতর্কতা হিসেবে অন্য একটি বাড়িতে অন্যদের থেকে পৃথক করে রাখা হল আর কাসোলীর ইংরেজ ডাক্তারকে বেতার বার্তা পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল যে এমন পরিস্থিতিতে এর কোনও চিকিৎসা আছে কি না। ডাক্তারের পক্ষ থেকে বেতারে উত্তর এল, এখন এর কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু সেই অসহায় ও প্রবাসী ছেলেটির জন্য আমার ভীষণভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হল। আমার শুভাকাঙ্খীরাও তার জন্য দোয়া করার জন্য পীড়াপীড়ি করল। কেননা, সেই অসহায় অবস্থায় তার অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও মনের মধ্যে এই ভয় উঁকি দিচ্ছিল যে, যদি সে মারা যায়, তবে তার এই অপমৃত্য শত্রুদের জন্য পরীক্ষার কারণ হবে। একথা ভেবে আমার হৃদয় তার জন্য ভীষণভাবে ব্যাথিত ও অস্থির হয়ে উঠল। আর অলৌকিকভাবে তার জন্য বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হল, যা নিজের নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টি হয় না। বরং কেবল খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। আর তৈরী হলে খোদা তা'লার আদেশে তা এমন প্রভাব দেখায় যার দ্বারা মৃত যেন জীবিত হয়ে ওঠে। যাইহোক তার জন্য খোদার দরবারে গ্রহণীয়তার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আর সেই মনোযোগ যখন শিখর স্পর্শ করল আর বেদনা আমার হৃদয়কে ঘিরে ধরল, তখন সেই রোগীর উপর, বস্তুত যে মৃতপ্রায় ছিল, সেই মনোযোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া শুরু করল। আর যে কিনা পানি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ত আর আলো দেখে ছুটে পালাত, হঠাৎ করে তার স্বাস্থ্যের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়ে নিরাময় হতে শুরু করল। সে বলল, 'এখন পানিকে আর ভয় লাগে না। তাকে পানি দেওয়া হল, আর নির্ভয়ে সে পানি পান করল। এমনকি পানি দ্বারা ওযু করে নামাযও পড়ল। আর সারা রাত নিদ্রা গেল। তার ভয়াবহ ও পশুসুলভ অবস্থা ক্রমেই স্তিমিত হতে থাকল। এমনকি কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য লাভ করল। আর তৎক্ষণাৎ আমাকে অলৌকিকভাবে বোঝানো হল যে এই উন্মাদনার অবস্থা তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি হয় নি, বরং খোদার নিদর্শন প্রকাশ পাওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৮০-৪৮১)

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! এই ব্যক্তি যার নাম আব্দুল করীম পিতার নাম আব্দুর রহমান, কর্ণাটকের তিমাপুর গ্রামের বাসিন্দা। আল হামদোলিল্লাহ্॥ আজ সেখানে একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠিত। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) - এর কবুলিয়্যতে দোয়ার ঘটনা অসংখ্য রয়েছে যা স্বল্প সময়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দোয়ায়

দোয়ায় অসুখ হতে আরোগ্য লাভ হয়েছে যারে নিরাময় বা চিকিৎসা সম্ভব হয় নি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যু পথযাত্রী রোগী জীবিত হয়েছে। সন্তানহীনরা সন্তান লাভ করেছে। কিন্তু হুযুর (আ.) সন্তানদের জন্য দোয়ার আবেদনকারীকে বলেছেন যে হযরত যাকারিয়া (আ.)এর মত তওবা করো। এবং সন্তানদেরকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করো। সুতরাং হযরত মুন্সী আতা মুহাম্মদ সাহেব পাটোয়ারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন আমি অ-আহমদী ছিলাম এবং গুরুদাসপুর জেলার নাজোয়াতে পাটোয়ারী ছিলাম। তখন কাজি নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেব খতিব বাটালবী যার সম্পর্কে আমার সম্পর্ক ছিল, তিনি আমকে হযরত সাহেব সম্বন্ধে অনেক তবলীগ করতেন। কিন্তু আমি কোনও গুরুত্ব দিতাম না। একদিন তিনি আমাকে অনেক জ্বালাতন করলেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি আপনার মির্যা সাহেবকে চিঠি লিখে একটি বিষয়ে দোয়া করতে বলব। যদি এ ব্যাপারে কাজ হয় তাহলে আমি নিশ্চিত জানতে পারব যে তিনি (আ.) সত্যবাদী। সুতরাং আমি হযরত সাহেবকে এই মর্মে চিঠি লিখি যে, আপনি ওলী হওয়ার দাবি করেন। আর ওলীদের দোয়া গৃহীত হয়। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যে আমার জন্য অতি সুন্দর সাহেবে ইকবাল এক সন্তান আমার পছন্দের স্ত্রীর গর্ভে যেন দান করেন।এবং নীচে আমি লিখেছিলাম যে আমার তিনজন স্ত্রী আছেন আজ পর্যন্ত কারো হতে কোন সন্তান হয় নি। আমি চাই যে, আমার প্রথম স্ত্রীর গর্ভ হতে সন্তান হোক। হযরত সাহেবের পক্ষ হতে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের লেখা একটি চিঠি পেলাম যে, খোদার নিকট দোয়া করা হয়েছে, আল্লাহ্ আপনাকে একটি পুত্র সাহেব ইকবাল খুব সুন্দর সন্তান দান করবেন। আপনি যে স্ত্রীর পক্ষ থেকে চান দান করা হবে। তবে শর্ত হল, আপনাকে

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। - *(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)*

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 9-16 March, 2023 Issue No. 10-11

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs.12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যাকারিয়ার মত তওবা করতে হবে। মুন্সি আতা মোহাম্মদ সাহেব বলেন, 'আমি ওই সময় অধার্মিক ও মাদক সেবনকারী ছিলাম। আমি যখন মসজিদে গিয়ে মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যাকারিয়ার মত তওবা কেমন হয়? লোকেরা অবাক হয়ে গেল যে এ শয়তান কেমনভাবে মসজিদে প্রবেশ করল। কিন্তু সেই মোল্লা আমাকে উত্তর দিতে পারল না। তারপর আমি ধরমপুর কোর্ট এর মৌলবী ফতেহ দ্বীন সাহেব আহমদীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যাকারিয়ার মত তওবা এটাই যে, বেদ্বীন ও অধার্মিকতা পরিহার কর। বৈধ জিনিস খাও। নামায রোযার প্রতি আকৃষ্ট হও। মসজিদে বেশি বেশি করে আসা-যাওয়া কর। একথা শোনার পর আমি তা শুরু করে দিই ।

করে দিই। মদ্যপান পরিহার করেছি। উৎকোচ গ্রহণ পরিহার করেছি। নামায রোযার প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হয়েছি। ৪-৫ মাস অতিবাহিত হয়েছে। আমি একদিন বাড়ি গিয়ে দেখলাম, প্রথম স্ত্রী কান্নাকাটি করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, প্রথমে আমার কষ্ট ছিল যে আমার সন্তান হচ্ছিল না, তার উপরে আরো দুটি স্ত্রী এনেছেন। এখন কষ্ট হল, আমার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে। সন্তান লাভের কোনও রকম আশা ও সম্ভাবনা ছিল না। সেই দিনগুলোতে তার ভাই অমৃতসরে একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাই তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমার ভাইয়ের কাছে পাঠানো হোক। যাতে করে আমি চিকিৎসা করাতে পারি। আমি বললাম, ওখানে গিয়ে কি করবে? এখানে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাও। তাই তিনি দায়মাকে ডেকে বললেন, আমাকে কিছু ঔষধ দিন। দায়ী তাকে দেখে বলল, আমি ঔষধও দিব না আর তোমাকে স্পর্শও করব না। কেননা, আমার মনে হচ্ছে যে খোদা আপনার মধ্যে ভুলে গেছেন। (অর্থাৎ আপনি তো বন্ধ্যা ছিলেন, এখন আপনার গর্ভে সন্তান আছে। সুতরাং খোদা তা'লা ভুল করে আপনাকে অন্তঃসত্ত্বা করে দিয়েছেন। (নাউযু বিল্লাহ) তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একথা বলতে শুরু করলেন যে খোদা ভুলে গেছেন। কিন্তু আমি তাকে বললাম, এরকম কথা বলবেন না। আমি মির্যা সাহেবকে দিয়ে দোয়া করিয়েছিলাম। পরে মুন্সী সাহেব বলেন, কিছু সময় পর গর্ভধারণে সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমি আশেপাশের সমস্ত লোকদেরকে বলতে শুরু করলাম যে, এখন দেখতে পাবে যে আমার ঘরে সন্তান হবে এবং খুব সুন্দর হবে। কিন্তু বড় আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। লোকেরা বলতে লাগল এই রকম হওয়াটা তো বড় কেরামতের ব্যাপার। অবশেষে এক রাত্রিতে পুত্র সন্তানের জন্ম হল এবং সে খুব সুন্দর ছিল। আমি ওই সময়ে ধরম কোটে চলে গেলাম। যেখানে আমার অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল। লোকদেরকে সন্তান জন্মের সংবাদ দিলাম। এরফলে সেই সময় অনেক লোক বয়আত করার জন্য কাদিয়ান চলে আসে, কিন্তু কিছু লোক আসল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যুবকদের মধ্য থেকে অনেকে বয়আত করেছিল। এবং সেই সাথে আমিও বয়আত করেছিলাম। আর ছেলের নাম আব্দুল হক রাখা হল। মুন্সী সাহেব বলেন, আমার বিয়ে করা ১২ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছিল। কোনও সন্তান জন্মায় নি। মুন্সী সাহেব আরো বলেন, আমি আসি তখন ওই মসজিদের যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি বাগানে গিয়ে হযরত সাহেবের সাথে দেখা করে নিজের স্বপ্নের কথা বলি যে, আমি স্বপ্নে দেখি আমার হাতে একটি খরবুজা আছে যা আমি কেটে খেয়েছি। এবং তা খুব সুস্বাদু ও রসালো ছিল। কিন্তু যখন্ ামি তার থেকে একটি অংশ কেটে আব্দুল হককে দিই, তখন সেটা শুষ্ক হয়ে যায়। হযরত সাহেব এই স্বপ্নে ব্যাখ্যা করেন যে, আব্দুল হকের মায়ের সাথে আপনার ঘরে আরও একটি পুত্রের জন্ম হবে। কিন্তু সে মারা যাবে। সুতরাং মুন্সী সাহেব বলেন, আরও একটি সন্তান হয়ে মারা যায়। লেখক বলেন, আমি আব্দুল হককে দেখেছি, সে একজন সুদর্শন এবং আভিজাত্যপূণ্য সন্তান। ঐ সময় ১৯২২ সালে তার বয়স ২২ বছর।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার মাধ্যমে ধর্ম সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছে। এবং ভয়-ভীতির অবস্থা শান্তিতে পরিবর্তিত হয়েছে। তার প্রার্থনায় বহুগ্রামের মানুষ আহমদী হয়েছে। এই বাৎসরিক জলসায় কাশ্মীরের নাসরাবাদের অনেক আহমদী বসে আছেন। তাদের জন্য এবং আমাদের জন্য এই বর্ণনা অবশ্যই ঈমান উদ্দীপক। কাশ্মীরের অধিবাসী খাজা ,আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, মৌলবী কুতুবুদ্দীন সাহেব যিনি কাশ্মীরের সুরাত গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একবার বলেন,যখন আমি আহমদী হই। তখন আমার গ্রামে অন্য কেউ আহমদী ছিল না। সেই সময় আমার খুব বিরোধিতা শুরু হয়। আর এই বিরোধিতার কারণে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট একটি পত্র লিখে দোয়ার আবেদন জানাই। যার প্রত্যুত্তরে হুযুর আকদস আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন এবং বলেন, সেখানেও অনেক মানুষ ঈমান্ আনবে অর্থাৎ আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। খাজা আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, পরবর্তীতে অবশ্য সেই সব মানুষদের মধ্য থেকে কেউ আহমদীয়াআনে নি যারা শর্ত রেখেছিল। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম মসুমাহ কোনিপুরা গ্রামের সকলে আহমদী হয়ে গেছে, বর্তমানে যেগ্রামের নাম নাসরাবাদ। এই গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা আহমদী হয়ে গেছে। এই অঞ্চলের বহু স্থানে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করেছে। লেখক বলেন, খাজা সাহেব খুব তাড়হুড়ো করেছেন। যদি হযরত এই রকম বলে থাকেন তাহলে ধৈর্য ধারণ করুন। সুরাত গ্রামও আহমদীয়াত থেকে বঞ্চিত হবে না। সেখানেও একদিন আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হবে।

(সীরাতুল মাহদী, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. রেওয়ায়েত নম্বর-৮২৫)

আল হামদোলিল্লাহ। এখন সুরাত গ্রামেও আল্লাহ্‌র ফজলে অনেকগুলি পরিবার আহমদী হয়েছে। হযরত মির্যা মিঞা ফজল মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার দোয়ার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। হুযুর (আ.) বলেন, দোয়াই হল মোমেন ব্যক্তির হাতিয়ার। দোয়াকে কখনও পরিহার করা উচিত নয়। আবার দোয়া করতে গিয়ে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। মানুষের অভ্যাস হল কিছুদিন দোয়া করে তারপর দোয়া করা ছেড়ে দেয়। হুযুর (আ.) বলেছেন দোয়ার উপমা একটি কুয়োঁর মত। মানুষ যখন একটি কূপ খননের কাজ করে এবং পানি খুব নিকটে আসে তখন যদি সে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও হতাশ হয়ে খননের কাজ ছেড়ে দেয়। যদি সে আরও এক বিঘত বা অল্প একটু খনন করলে পানি পেয়ে যেত ও তার উদ্দেশ্য সফল হতো। একইভাবে দোয়ার কাজও এইরকম। মানুষ কয়েকদিন দোয়া করে তারপর বন্ধ করে দেয়।যার ফলে সে সফল হতে পারে না। ব্যর্থ হয়ে যায়।

(সীরাতুল মাহদী, প্রণেত- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. রেওয়ায়েত নম্বর-১২৪৯)

সুধী শ্রোতামণ্ডলী! আমরা বড় ভাগ্যবান যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধর্মীয় ও জগতিক জীবন উন্নতির জন্য খেলাফতে আহমদীয়ার উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ এক নেয়ামত ও আশিস দান করেছেন যা সূর্যের মত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট এবং খিলাফতে আহমদীয়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর এক নিখুঁত প্রতিফলন। আজও এই আধ্যাত্মিক খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণের নিদর্শন দেখান এবং আহমদী অ-আহমদী সকলেই খলীফার দোয়ায় ধন্য হচ্ছেন। বিশেষ করে খেলাফতে খামসা অর্থাৎ পঞ্চম খলীফার সময়কাল হল দোয়ার সময়। হযরত আকদস আমীরুল মোমেনীন (আই.) খেলাফতের পদে সমাসীন হওয়র পরেই যে কথা প্রতিটি আহমদীর কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং এটি হৃদয়ে স্পন্দন। জামাতী বন্ধুদের নিকট শুধু একটি আবেদন যে আজকাল দোয়ার উপর জোর দিন, দোয়ার উপর জোর দিন, দোয়ার উপর জোর দিন। দোয়া করুন আল্লাহ্ আহমদীয়াতে এই কাফেলাকে উন্নতির জন্য সমর্থন ও সাহায্য করুন। আমীন। (বদর পত্রিকা, ২৯ শে এপ্রিল, ২০০৩, পৃ: ১৫) আল্লাহ্ তা'লা একমাত্র সাক্ষী, তিনি কিভাবে হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) এবং জামাতের পবিত্র চেতা ব্যক্তিদের দোয়াকে গ্রহণ করেন এবং খেলাফতে খামসার পবিত্র ও বরকতময় যুগে কল্যাণের বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করে চলেছেন। আল্লাহুম্মা যিদ বারিকা। হযরত আমীরুল মোমেনীন তাঁর বক্তৃতায় দোয়া গ্রহণ হওয়ার এই ধরণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সৈয়্যদানা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র উপর আস্থা ও ভরসা এবং দোয়া গ্রহণীয়তার ঈমান উদ্দীপক ঘটনার মাধ্যমে তাঁর পবিত্র জীবনকে আমাদের হৃদয়ে স্থান পাওয়ার তৌফিক দান করুন। এবং আমরা খেলাফতে আহমদীয়ার পবিত্র পতাকা তলে রেজওয়ান মিনাল্লাহি আকবর জয়ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে। আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir